কলকাতা মহানগরী	১৩৬৮	চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
রূপনারানের কূলে	১৩৮৩	গোপাল হালদার
গোলাপ হয়ে উঠবে (উপন্যাস)	১৩৯৮	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিবাহে কান্নাপর্ব	১৪১৯	হিমাদ্রিশেখর বসু
মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন	১৪২৯	গোপাল হালদার
কবিতাগুচ্ছ	১৪৩৫	জগদীশ ভট্টাচার্য
	১৪৩৮	মণিভূষণ ভট্টাচার্য
	১৪৩৯	অশোক পালিত
	১৪৪০	দীপান্বিতা ভট্টাচার্য
	১৪৪১	তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়
র‍্যামফোরিংকাস (গল্প)	১৪৪২	অমল দাশগুপ্ত
সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা : ভিন্ন চিন্তা (আলোচনা)	১৪৪৮	গৌতম সান্যাল
পুস্তক পরিচয়	১৪৫৩	সুনীল সেন
	১৪৫৯	চিন্ময় গুহঠাকুরতা
	১৪৬১	কুশল লাহিড়ী
পাঠকগোষ্ঠী	১৪৬৩	অশোক মুখোপাধ্যায়
	১৪৬৬	ধ্রুব গুপ্ত
	১৪৬৬	তিমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায়
	১৪৬৮	শান্তি বসু
চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ	১৪৭৫	রবীন্দ্র মজুমদার
নাট্য প্রসঙ্গ	১৪৭৮	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সংস্কৃতি সংবাদ	১৪৮৩	চিন্মোহন সেহানবীশ
	১৪৮৭	সিদ্ধেশ্বর সেন

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী
সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে সত্য গুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

কলকাতা মহানগরী

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

কলকাতা শহরের পুঞ্জীভূত সমস্যা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল অবহেলার পর, মাত্র বছর দেড়েক হল, কর্তৃপক্ষ সজাগ হয়ে উঠেছেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞদল, মার্কিন রাষ্ট্রদূত, বিশ্ব ব্যাঙ্ক সকলেই কলকাতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় দু বছর হল মহানগরী-পুনর্গঠন-সংস্থার (C. M. P. O.) সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান কলকাতা ও শহরতলি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং জনসাধারণকে অবহিত করবার জন্য বহু মূল্যবান খবর দিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

যে জটিল ব্যাধি আজ এই মহানগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত করছে, সেই ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে শুধু কলকাতা কেন সারা বাংলাদেশ বিপন্ন হবে। এই শহরের ইতিহাস মাত্র তিন শো বছরের; অন্যান্য বহু শহর এর থেকে প্রাচীন; তবু এই শহরের সমস্যা আজ অন্য সব শহরকে ছাড়িয়ে গেল কেন? যে শহর একাধারে বন্দর, রাজ্যশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্রস্থল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, এবং প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের বাসস্থান, সেখানে আজ এমন কি ঘটেছে যার জন্য দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞরা শুধু পরিকল্পনার খাতেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে উদ্যোগী হয়েছেন?

যদি কালক্রমে গঙ্গা নদীর গতি সরে যায়, যদি ফরাক্কা বাঁধের কাজ সফল না হয়, তাহলে কি কলকাতা শহরও প্রাচীন তমলুক বা আদি সপ্তগ্রামের মতো, বা প্রাচীনতর মহেঞ্জোদারো হারাপ্পার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? আজ যদি হলদিয়াতেই কলকাতা বন্দরের বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়, তাহলেও কি কলকাতার এই প্রাধান্য বজায় থাকবে?

অতীতে যে-কোনো কারণেই এক-একটি নদীকেন্দ্রিক বর্ধিষ্ণু শহর নষ্ট হয়ে যাক-না কেন, এ কথা ঠিকই যে, তিন শো বছর ধরে কলকাতা শহর যে বিপুল অর্থ সম্পত্তি লোকবল নিয়ে গড়ে উঠছে এবং এর আকর্ষণীশক্তি এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে, নদী শুকিয়ে গেলে বা বন্দর আরো দক্ষিণে চলে গেলেও, এই শহরের গুরুত্ব হ্রাস পাবে না। দেশের লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে; নদী শুকিয়ে গেলেও ভূগর্ভে হাজার ফুট নল বসিয়ে জলের সমস্যা সমাধান করতে বিজ্ঞান পিছপাও হবে না। সম্প্রতি জিওলজিকাল-সার্ভে দপ্তর থেকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে বৃহত্তর কলকাতার উত্তরাঞ্চলে ভূগর্ভে সঞ্চিত জলের স্তর যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে জল-সরবরাহ-সমস্যা মেটানো যায়। বন্দর চলে গেলেও দ্রুত যানবাহন যে যুগে সারা পৃথিবীকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলেছে, সে যুগে এত বড়ো শহরের কাজ অচল হবে না। কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, সবই রাখতে হবে। তাই যতই প্রাকৃতিক বা অন্যান্য বিঘ্ন ঘটুক-না কেন কলকাতার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া কল্পনার অতীত।

সাধারণ লোকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সারা দেশ জুড়ে যখন গত দশ বছর ধরে পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, সেই পরিকল্পনার থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে একটি শহর ও তার শহরতলির জন্য পরিকল্পনা করবার কি প্রয়োজন ছিল! প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে কি কলকাতা পুনর্গঠনের খাতে টাকা ধরা ছিল না? অথবা গত দশ বছরে পুনর্গঠনের কাজ 'প্ল্যান'-মতো চলা সত্ত্বেও অবস্থা ইতিমধ্যে এতই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে যার দরুন, স্বতন্ত্র 'প্ল্যান' করার জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপন করতে হল? (এক সময় শোনা গিয়েছিল, মেয়র অল্ডারম্যান শেরিফ ছেড়ে এবার কলকাতার জন্যই এক মন্ত্রী নিয়োগের কথাও ভাবা হচ্ছে।)

কলকাতার সমস্যাগুলি কি, এবং তার সমাধানের পথই বা কি, এই মূল কথাটি স্বভাবতই আমাদের মতো অজ্ঞলোকের মনে আসছে। কি কি হলে আমরা মনে করব যে কলকাতার সমস্যাগুলি ঠিকমতো সমাধান হল?

শহরের মধ্যে যত খাটাল ও বস্তি আছে সব যদি আজ শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় এবং সেখানে বড়ো বড়ো বাড়ি তোলা যায় তাহলেই হবে? যে-সব লোক বস্তিতে অমানুষের মতো বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, তারা

আমাদের চোখের বাইরে চলে গেলেই কি সমস্যা চিরকালের মতো মিটল? আমাদের চাহিদার মধ্যে আর কি কি আসতে পারে ভেবে দেখা যাক: আরো বড়ো বড়ো রাস্তা; আরো বেশি সংখ্যায় ট্রাম ও বাস; আরো বেশি জল; ছেলেদের খেলার প্রশস্ত জায়গা; আরো বেশি সংখ্যায় পার্ক, সিনেমা বা স্কুল ও হাসপাতাল; অথবা 'প্রাইভেট' মোটর রাখবার প্রচুরতর ব্যবস্থা; কিংবা লণ্ডন নিউইয়র্ক মস্কো লেনিনগ্রাডের মতো সুড়ঙ্গপথে রেলগাড়ি! যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম আশাবাদী তাঁরা বলবেন, নিদেনপক্ষে বর্ষায় যদি রাস্তায় জল না দাঁড়ায়, গ্রীষ্মে যদি বসন্ত কলেরা টাইফয়েড না হয়, শীতের সন্ধ্যায় যদি 'ধোঁয়াসা'তে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে না হয়, তাহলেই মনে করব বেশ আছি! তেমনি আরেক দল বলবেন, পাড়ার ছেলেগুলো সারাদিন বিনা কাজে 'রক্'-এ বসে কাটায়, তারা যদি কাজকর্ম পায় তাহলেই তো মস্ত বড়ো সমস্যা মিটল। আরো একদল, যাঁরা আমাদের মতো নাকে মুখে গুঁজে ছুটছেন কলম পিষতে, তাঁরা বলবেন, অত কিছু নাই বা হল; ছেলেমেয়েরা যদি বিনা ভেজালে দুধটা বেশি করে পায়, মাছটা যদি তিন টাকার বেশি দরে কিনতে না হয়, আনাজপত্র যদি সস্তায় পাই, তাহলেই তো হল!

আরো যদি কেউ কিছু বলতে চান তো বলবেন খাটাল বস্তি যা হয় হোক, বড়ো রাস্তায় বিশেষত চৌরঙ্গী পাড়ায় রাস্তায় যেসব লোক শুয়ে থাকে তারা আমাদের এবং বিদেশী পর্যটকদের চক্ষুশূল, ওদের বিদায় করা হোক। আর যাঁরা সম্প্রতি পয়সার মুখ দেখেছেন, তাঁরা এগিয়ে এসে বলবেন, শহরে যত একতলা বাড়ি আছে সেগুলি ভেঙে আমরা সেখানে আট-দশ-তলা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি করে দিচ্ছি, আরো বেশি সংখ্যায় মোটরগাড়ি তৈরি করে দিই, শহরও দেখতে ছিমছাম হবে, লোকেরাও আরাম করে থাকতে পারবে; তাদের দোসররা আবার বলবেন, আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, আমরা 'এয়ার-কণ্ডিশন' যন্ত্র বেশি করে তৈরি করছি, যাতে মধ্যবিত্ত লোকেরাও সেকেলে হাতপাখা বা ফ্যান বাতিল করে আরামে থাকতে পারেন। সমস্যার তো অন্ত নেই; সবাইকে খুশি করতে গেলে এমনই ব্যবস্থা করা দরকার যাতে এই সব সমস্যাই একেবারে মিটে যায়।

কিন্তু এই লম্বা ফর্দ দেখে সরকার বলবেন, সবকিছু মেটাতে হলে যে টাকা লাগবে, সে টাকা আসবে কোথা থেকে? আমরা জবাবে বলব, সব টাকা তো আমাদের দিতে হবে না; প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার আছেন

আমাদের সঙ্গে তাদের অবারিত রাজকোষ নিয়ে, আর তারও পিছনে আছেন, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, আমেরিকার সরকার ; আমাদের ভাবনা কি ? কুতর্কের জন্য একদল বলবেন, এত টাকা শোধ করবে কে ? আরো কোনো তার্কিক হয়তো বলবেন, আমাদের এখনকার অবস্থা যতই খারাপ হোক-না কেন, আমরা, এই কয় বর্গমাইলের মধ্যে, বিজলি আলো পাখা ট্রাম বাস সিনেমা এসব নিয়ে তো আছি একরকম, কিন্তু মাত্র কয়েক মাইল দূরেই, অন্ধকারের মধ্যে যে-সব গ্রামবাসী পিলসুজের মতো মাথায় প্রদীপ নিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তারা কি দোষ করল ? তারা কি এই আরামের একাংশও পেতে পারে না ? আর যদি কেউ তাদেরই মধ্যে গ্রামে অন্নসংস্থান করতে না পেরে মরিয়া হয়ে শহরে এসে হাজির হয়, তাদের কি আমরা শহরে ঢুকতে, এমনকি ফুটপাথে শুয়ে থাকতেও দেব না ? যদি-বা তাদের ফিরিয়ে দিতে হয়, কারা তাদের ফেরাবে ? আমরাই কি সে কাজ করব, যারা চাকরি আর ব্যবসার খাতিরে গ্রাম বা মফস্বল শহর ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছি ?

গত বছরের আদমশুমারে দেখা গেছে, বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কলকাতা শহরের লোকবৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্গমাইল-পিছু জনসংখ্যা যদি প্রায় ৯০,০০০-এর কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায় আর তারই সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখি কলকাতার পার্শ্ববর্তী পঁয়ত্রিশটি শহরে আরো দশ-বারো লক্ষ লোক এসে হাজির হয়েছে, তবে সান্ত্বনা পাবার কিছু আছে কি ?

আমরা অনেকেই বোধহয় আশা করি যে আমাদের শহর সব দিক দিয়ে নিউইয়র্ক-লণ্ডনের মতো হবে। কিন্তু, পাকাবাড়ি, পিচঢালা রাস্তা, ট্রামবাস, বিজলি বাতি, রেডিও, হোটেল-রেস্তোঁরা, যার প্রায় সব কিছুই, হয় বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে, বা নকল করা হয়েছে, তার বাইরে ওদেশের শহর এবং আমাদের শহরে মিল কোন্‌খানটায় ? যে-সব কারণের সমন্বয়ে শহরে লোক জমায়েত হয়, তার কোন্‌গুলি উভয় দেশে তুলনীয় ? আমেরিকা-ইওরোপেও এককালে গ্রাম ছেড়ে শহরে লোক এসেছে ; গ্রাম সম্বন্ধে অসন্তোষ, বা শহরের প্রতি আকর্ষণ সবই আছে ওদেশে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের শহর তৈরির ইতিহাস আর সে দেশের শহর তৈরির ইতিহাসে যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে তা আমরা আজকের এই শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার ডামাডোলের মধ্যে ভুলেই গেছি।

গত শতাব্দী থেকেই কলকাতায় লোকের ভিড় হতে শুরু করেছে গ্রামীণ জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হবার দরুন। গ্রাম থেকে কুটিরশিল্প নির্মূল হল, জমির উর্বরতা কমতে শুরু হল, অসুখবিসুখের প্রতিকার নেই, আনন্দের সব উৎস শুষ্ক ; দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে, পরিবার পরিজন রেখে, শুধু রোজগারের জন্য লোক এসে জমায়েত হল শহরে। আদমশুমারের বিশাল রিপোর্টগুলি থেকে আমরা জানতে পাই, কত লক্ষ লোক সংসারবিহীন অবস্থায় বস্‌তির মধ্যে কাটাচ্ছে আর কত লক্ষ লোক অন্যত্র সংসার রেখে আসার উপায় নেই বলে বস্‌তিতে পশুজীবন যাপন করছে। পুরুষের সংখ্যাধিক্য এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত দুঃস্থ লোকের সংখ্যার প্রাচুর্য, দুইই কলকাতার পুরাতন সমস্যা। সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা এখানে রোজগারের জন্যই আছে তারা অনিবার্যভাবে কলকাতার সামাজিক জীবন দূষিত কলুষিত করছে। আজ কলকাতার প্রায় চল্লিশ বর্গমাইল বা পার্শ্ববর্তী শিল্পকেন্দ্রগুলির দেড়শো বর্গমাইলের মধ্যে যত লক্ষ লোক যে অবস্থার মধ্যে আছে, তার ক্ষীণতম তুলনাও আমরা লণ্ডন-নিউইয়র্কে পাব না। ঐসব শহরে যে সবাই স্বর্গসুখে আছে তা অবশ্যই নয়, তবে সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণই ভিন্ন। সেখানকার শহরের সঙ্গে আমাদের শহরের বাহ্যিক মিল যতই থাকুক-না কেন, মূল অর্থনৈতিক কারণ, দুটি ভিন্ন উৎস থেকে উঠছে।

কলকাতা শহরের ধারণ-ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত লোকের সমাবেশ এও যেমন গত শতাব্দী থেকেই চলে আসছে, কলকাতা নগরীর সম্প্রসারণ এবং যুগোপযোগী উন্নয়ন-ব্যবস্থাও কিছু-না-কিছু বরাবরই চলে আসছে। আজই যে অকস্মাৎ আমরা জীর্ণ পুরাতন কলকাতাকে সংস্কার করতে শুরু করেছি তা যদি বলি তাহলে আমরা ইতিহাসকে অস্বীকার করব। একথা আমরা হয়তো বলতে পারি যে, সে-যুগের কর্মকর্তারা যথেষ্ট দূরদর্শিতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুবিধার কথা ভেবে তাঁদের সংস্কার কাজগুলি করেন নি।

সে যুগের লোকদের যদি আজ জবাব দেবার উপায় থাকত তো তাঁরা বলতেন, "আমাদের যুগে কলকাতা ছিল ইংরেজের শহর ; আমাদের থাকতে হত 'কালা আদমি'দের পাড়ায় (Blacktown), উত্তর-কলকাতায়। আমাদের হাত-পা ছিল বাঁধা, অপমান ছিল দুঃসহ। আজ তোমরা স্বাধীন

দেশের বাসিন্দা; সাদা-কালোর ভেদ গেছে ঘুচে; তোমরা মনের মতো করে শহর ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ো, কিন্তু এমনভাবে করো যাতে তোমাদের বংশধররা আবার তোমাদের এই বলে দোষ না দেয় যে তোমরা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই কাজ করেছ, যথেষ্ট দূর পর্যন্ত না দেখে কাজ করেছ।"

এ কথা সত্যি যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক, সবকিছু ছেড়ে হঠাৎ কলকাতায় এসে পড়াতে আমাদের সমস্ত কাজের ধারা গেল ওলটপালট হয়ে। যতটুকু ভালো কাজই এই কয় বছর করি-না কেন, যে-পরিমাণ লোক হঠাৎ এসে হাজির হল তাদের সকলের প্রয়োজনীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে না, নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।

তার পরেও পনেরো বছর কেটে গেছে, স্বাধীনতার আগে আমরা যতটুকু অর্থব্যয় করতে পারতাম, আজ তার থেকে বহুগুণ বেশি অঙ্কের টাকা দেশ-বিদেশ থেকে আমাদের হাতে আসছে; শহর পুনর্গঠনের কাজে এত সাহায্য, এত অর্থ আমরা কোনোদিনই একসঙ্গে এভাবে পাবার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। উদ্বাস্তুরাও ইতিমধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে, দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবেই যোগ দিয়েছে। এখন তাহলে আমাদের কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে?

বছরখানেক আগে টেরিটি বাজারে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যখন জমি নিলাম করলেন, এককাঠা জমি (৭২০ বর্গ ফুট) ৭৫০০০৲ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। কলকাতা ও শহরতলির পুনর্গঠন হবে এই সংবাদ সরকার ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধোত্তর পর্বে যাঁরা টাকার আস্বাদ পেয়েছেন তাঁরা হু হু করে জমি কিনে ফেলেছেন; সময় যখন আসবে 'ন্যায্য' মূল্যেই তাঁরা সরকারকে জমি ছেড়ে দেবেন। বিচক্ষণ লোক এঁরা; ভালো করেই জানেন যে কলকাতা ও তার আশেপাশের জমি আজকাল সোনার থেকেও ভালো ও নিরাপদ সম্পত্তি। সরকার যে 'ন্যায্য' মূল্য দেবেন, তা নির্ধারিত হবে Fundamental Rights-এর নিয়মাবলী বজায় রেখে; সরকারের টাকা আসবে ট্যাক্স থেকে বা বিদেশী লগ্নি থেকে। জমির দাম উত্তরোত্তর উর্ধ্বমুখী চলবে, এবং যতদিনে আমাদের 'সুদূরপ্রসারী' পরিকল্পনা কার্যকরী হবে, ততদিনে এই ব্যবসায়ীদের

অসংখ্য এইসব ছোটোখাটো 'স্বল্পমেয়াদী' পরিকল্পনা এমনভাবে নীরবে কাজ করে চলবে যে শুধু প্রয়োজনীয় জমি কেনবার বাবদেই সরকারী তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে হঠাৎ-বড়োলোকদের আরো বড়োলোক করে দেবে।

সামান্য বিত্তের লোক যারা আগে সারাজীবন সঞ্চয় করত একটি বাসস্থান তৈরির জন্য, তারা ক্রমেই শহরতলির দিকে হটে যাবে; তবু তাদের এই সান্ত্বনা থাকবে যে 'আমরা এমন শহরের বাসিন্দা, যেটি এককালে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী; এখানে শতকরা এতগুলি বাড়ি চৌদ্দতলা, এতগুলো সিনেমা-হলে এয়ারকণ্ডিশন-যন্ত্র আছে' ইত্যাদি।

বস্তিও উঠে যাবে শহরের মাঝখান থেকে, যেমন বরাবরই আগেও উঠেছে; সেখানকার লোকেরা গিয়ে ভিড় করবে শহরের চৌহদ্দির ঠিক বাইরেই, আবার যেদিন শহরের আয়তন বাড়বে, আবার সেদিন নতুন আস্তানা খুঁজবে আরো দূরে গিয়ে।

যারা ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করে, তারা দেখবে অন্তত দু-ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে না বেরোলে কর্মস্থলে পৌছানো চলে না। অপরদিকে বড়ো বড়ো রাস্তা যত হবে, তার থেকে বেশি হারে 'প্রাইভেট' মোটরের সংখ্যা বাড়বে; একদিন আমরা নিউইয়র্কের মতো মোটরের পার্কিং-এর জন্য সাততলা 'পার্কিং-কর্নার' বানাবার কথাও হয়তো ভাবব। ডালহৌসি স্কোয়ারে টিনের ছাউনিটি বোধহয় ইতিমধ্যে তারই সূচনা করছে।

কথা উঠবে, এ ছাড়া উপায়ই বা কি? জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ি তো সবদেশেই কষ্ট করে চড়তে হয়, যারা পেরেছে তারা মাটির তলায় রেলগাড়ি চালাচ্ছে, আমরাও দরকার হলে তার কথা ভাবব। ইতিমধ্যেই তো বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে লেনিনগ্রাড ও কলকাতার জমি যখন একই রকম, এবং লেনিনগ্রাডে যখন 'টিউব-রেলওয়ে' আছে, তখন আমরাও এখানে ঐ ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করতে পারি। টাকার যদি অভাব ঘটে, ধার নেব, অচিরে সে টাকা উঠে আসবে। অপরদিকে, যাদের সংগতি আছে বা হবে, তারা নিজেদের গাড়ি রাখবে বইকি, এবং তার জন্য ব্যবস্থাও করতে হবে; মাথাপিছু কতগুলি গাড়ি দেশে আছে সেটা তো দেশের ঐশ্বর্যের এক বিশেষ মানদণ্ড! জমি যেখানে কম সেখানে অপেক্ষাকৃত কম সংগতিপন্ন লোকেদের ভিড়

করা নিষ্প্রয়োজন ; তাদের শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শহরে থাকার মূল্য শক্তি-অনুযায়ী সবাইকেই তো দিতে হবে ; আর সকলেই এসে কলকাতায় ভিড় করলে চলবেই বা কি করে! আমরা তো শিল্প-বিকেন্দ্রীকরণ (decentralization) নীতি গ্রহণ করেইছি।

সবই ঠিক কথা, কিন্তু প্রশ্নটা কি সেখানেই মিটছে? মিটলে কতদিনের জন্য মিটছে? একথা কি আমরা বলতে পারব যে, বৃহত্তর কলকাতা আজ যতজনের সুখে-স্বচ্ছন্দে বাসের জন্য পুনর্গঠিত হবে, তার বেশি লোক এসে আরো দশ-বিশ বছর বাদে বৃহত্তর ও জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি করবে না?

কলকাতায় ক্রমাগত লোক আমদানির যে-ধারা গত একশো বছর ধরে চলেছে, তার গতি রোধ করবার জন্য আমাদের কোন্ সমস্যার মূলে হাত দিতে হবে?

মানলাম যে 'টিউব-রেলওয়ে' অনেক সমস্যার সমাধান করবে, কিন্তু আমাদের যা আর্থিক সংগতি এবং শিল্পের যে স্তরে আমরা এখানে আছি তার কোনোটাই কি ইওরোপের কোনো দেশের সঙ্গে তুলনীয়? লেনিনগ্রাডের জমি নাহয় কলকাতার মতো, কিন্তু রাশিয়ার যে শিল্পসম্ভার এবং অর্থসংগতি লেনিনগ্রাডের 'টিউব-রেলওয়ে' গড়বার এবং চালানোর মূলে আছে, তার সামান্যতম অংশও কি আমাদের আছে? জটিল যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য প্রতিপদেই যদি আমাদের পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয় তাহলে আমরা কি ভূগর্ভে রেলগাড়ি চালানোর সাহস করতে পারি?

'প্রাইভেট' মোটরগাড়ির সংখ্যা নাহয় আরো বাড়ল। আমেরিকায় প্রতি তৃতীয় ব্যক্তির একটি করে মোটরগাড়ি হবার পরেও তাদের দেশে যানবাহন-সমস্যা কি রকম দাঁড়িয়েছে সেটি অনুধাবনযোগ্য। আর তাছাড়া যে দেশ পেট্রোলিয়াম, লোহা, কয়লা ও অন্যান্য সমস্ত রসদে ধনশালী, তাদের অনুকরণ করে আমরা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? আর বৃহৎ শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ যতই হোক-না কেন, কৃষিক্ষেত্রে যতদিন উদ্বৃত্ত লোক বেড়ে চলবে এবং সেই সব উদ্বৃত্ত লোকের কাজের সংস্থান শহরের বাইরেও না থাকবে, ততদিন কি কলকাতায় লোক আসার হার কমবে? গত দশকে যদি কলকাতায় লোকবৃদ্ধির হার কম মনে হয়ে থাকে, সেই সঙ্গে দেখতে হবে পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে কি পরিমাণ লোকসমাবেশ হয়েছে।

অপরদিকে কলকাতা শহর যদি ক্রমেই আরো ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আরো

কতকগুলি সমস্যার মূলে না গিয়ে আমরা পারব না। চাষের উৎপাদন যতদিন বিশেষভাবে বেড়ে না যাচ্ছে, ততদিন আমরা আমেরিকার মতো কৃষির জমি অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে দিয়ে চাষের জমি কমানোর কুফল এড়াতে পারব না। সেইসঙ্গেই জমির দাম বাড়লে আখেরে কৃষিপণ্যের দামও যেমন বাড়বার সম্ভাবনা থাকবে, তেমনি গ্রাম-অঞ্চলে পাকা কোঠার শহরতলি গড়ে উঠলে দরিদ্র গ্রামবাসীদের আরো হটে যেতে হবে, তারা তাদের জমির বিনিময়ে হয় পাবে নিকৃষ্টতর জমি নয়তো নগদ বিদায়। সেখানেও 'শহুরে বাবু'দের পাশে বস্‌তি গড়ে উঠবে, অর্থাৎ শহরের এমন প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে যার সামাজিক ফল ভালো নাও হতে পারে। তাছাড়া পাকাবাড়ি তৈরির যে খরচ ও রসদপাতি লাগবে, তা কোথা থেকে জোগান হবে? যারা শহর থেকে দূরে গিয়ে থাকতে বাধ্য হবে অথচ যাদের রোজগারের জন্য দৈনিক শহরে আসতে হবে, তাদের জন্য যানবাহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেই হবে। কর্মস্থল থেকে বাসস্থানের দূরত্ব যতই বেড়ে চলবে, চলাচলের জন্য কয়লা পেট্রোলিয়ামের খরচও ততই বেড়ে চলবে। আমাদের দরিদ্র দেশে, যেখানে কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রধানতঃ শিল্পে ব্যবহারের জন্যই রাখতে হবে, এই সম্পদ কতখানি আমরা দৈনন্দিন চলাচলের জন্য খরচ করতে পারব, সে কথাও পরিকল্পনা-বিশারদদের ভাবতে হচ্ছে।

তাহলে কি করণীয়? দেখা যাচ্ছে সমস্যাটি মুখ্যতঃ স্থাপত্যবিদ্যাবিশারদদের আওতায় যত-না পড়ে তার থেকে বেশি পড়ে অর্থনীতিবিশারদদের আওতায়। আরো বোঝা যাচ্ছে, সমস্যাটি যত-না কলকাতা শহরের মধ্যে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে কলকাতার বাইরে থেকে উদ্ভূত হচ্ছে।

একদলের সম্ভবত এই অভিমত হবে যে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শহরগুলি যতটুকু সীমানার মধ্যে আছে তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকুক, আর করপোরেশন, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর যে কাজের ভার আছে সেইটুকুই যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তার ব্যবস্থা করা হোক। আর আমাদের টাকার সংগতি বুঝে, এযাবৎ যে-সব প্রস্তাব ভালো করে প্রবর্তিত হচ্ছে না, অথবা যেসব কাজ শুরু করা হয়েছে সেগুলি ত্বরান্বিত করা হোক। দুর্গাপুর থেকে গ্যাস এলে 'ধোঁয়াসা'র উৎপাত বন্ধ হবে, পলতা থেকে জলের পাইপ আসার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা হোক, রাস্তার

নিচের জলের পথগুলির পাক সরানো হোক, বস্‌তিগুলি ভেঙে পাকা কুঠরির বাড়ি হোক যাতে বস্‌তির লোকেরা অল্প ভাড়ায় থাকতে পারে, জলের অপচয় বন্ধ করা হোক, জনসাধারণের জন্য যানবাহন আরো বেশি সংখ্যায় চলাচল করুক, রাস্তাগুলি ভালো করে মেরামত করা হোক। এক কথায় যেসব কাজ করপোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটি করে উঠতে পারছেন না, সেইসব কাজই যদি যথেষ্ট উদ্যমের সঙ্গে করা হয়, আর যেসব কাজ অর্ধসমাপ্ত আছে সেগুলি শেষ করা হয় তাহলেই নাগরিক-জীবন অপেক্ষাকৃত সহনীয় হবে। এর বেশি কিছু করা হয়ে উঠবে না নানা কারণে; আর যদি-বা সম্ভব হয়, তার জন্য যে বিপুল টাকা ব্যয় করতে হবে, তার মধ্যে এঁদের মতে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর যাঁরা কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকতে চান, তাঁদের সুবিধার জন্য তো ইলেকট্রিক ট্রেন হয়েছে, আরো হচ্ছে, তাহলেই তো সমস্যা মিটে যেতে পারে অনেকটা। কলকাতা শহরের মধ্যেও কয়েক জায়গায় যদি ইলেকট্রিক ট্রেন আসে তাহলে যানবাহন-সমস্যার সমাধান হয়।

কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের অসহনীয় অবস্থার মধ্যে থেকে যারা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তাঁরা বলবেন, এইসব মোটা সমস্যাগুলি আগে মেটানো হোক, এখন বড়ো রাস্তার বাঁ দিকে বাজার বসলে আপিস-ফেরত গাড়িওয়ালা লোকদের সুবিধা হবে, না, ডান দিকে বসলে হবে, এই নিয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা যে চিন্তা করছেন, অত চিন্তা এখানে নিষ্প্রয়োজন; ফুটপাতে যারা শুয়ে থাকে তারা জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ বা তার পেশা কি তাই নিয়ে সূক্ষ্ম হিসাব যা হচ্ছে তা যদি নাও ভাবা যায় তাহলেই বা ক্ষতি কি? আমেরিকার আদর্শ নগরীগুলিতে যেসব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য যে পরিমাণ জমি—হাটবাজার, খেলার জায়গা, ফাঁকা মাঠ ইত্যাদি রাখা দরকার, তা আমরা কোথা থেকে পাব? অতএব মোটা সমস্যাগুলির কথা আগে ভাবা হোক।

কলকাতায় যত লোক ন্যূনতম প্রয়োজন বাদ দিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ করেছে, তাদের সকলের জন্য উপযুক্ত ঘর করতে হলে কত টাকা, কতটা জায়গায় কি পরিমাণ রসদপত্র লাগবে, তার হিসাব খুঁজতে খুব বেশিদূর যেতে হবে না। আর সেই সঙ্গেই আবার সেই প্রশ্ন আসবে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামবাসীরা, যারা শহরের কোনো সুবিধাই পাচ্ছে না, অথচ শহরের

প্রভাবের মধ্যে থেকে অর্ধভুক্ত অবস্থায় আছে, তাদের জন্য কি করণীয়? শহরের বস্‌তিতে যারা আছে, তারা যতই খারাপ অবস্থায় থাকুক, দরকার হলে তাদের জন্য হাসপাতাল আছে, সিনেমা আছে, পাকা রাস্তাঘাট কলের জল আছে; পৃথিবীর আলো যতই ঝাপসা হোক-না কেন, কিছুটাও পৌঁছচ্ছে। আর যারা এই বিরাট চুম্বকের মতো শহরটির কাছে হাওড়া হুগলী চব্বিশপরগণার এবং বর্ধমান নদীয়া মেদিনীপুরের সংলগ্ন অঞ্চলে আছে, তারা শহরের আঁচটা পাচ্ছে, আলোটা পাচ্ছে না। যাদের জমি আছে, তারা অবশ্যই শহরে পণ্য বিক্রি করে অর্থ পাচ্ছে, কিন্তু যেসব অসংখ্য জমিবিহীন লোক ঐসব অঞ্চলে আছে তারা দেখছে, মহাজনরা ট্রাক্‌ ভরতি করে খাদ্যদ্রব্য শহরে চালান করছে, গ্রামে ছিটেফোঁটাও পড়ে থাকছে না। নিতান্তই পেটের জ্বালায় তারা পাড়ি দিচ্ছে শহরের দিকে, যদি কিছু কাজ পায়, যদি কিছু উচ্ছিষ্ট জোটে। আর এই স্রোত বইছে শুধু পাশের গ্রামগুলি থেকে নয়, দেশের সব জায়গা থেকে। যদি কলকাতাকে আমরা আরো 'আধুনিক' ভাবে সজ্জিত করি, তাহলেই কি এই জনস্রোত বন্ধ হবে?

সারা দেশ জুড়ে যেটি অবিলম্বে করতে পারলে ভালো হত, অথচ যেটা নানা কারণে সম্ভব নয়, একটি ছোটো জায়গার মধ্যে আমরা যদি তার প্রয়োগ করতে পারি তাহলে হয়তো কিছুটা ফল পেতে পারি।

খড়্‌গপুর, বর্ধমান, কালনা, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যে অবিলম্বে এবং প্রথম পর্ব হিসাবে, জমি হস্তান্তর বন্ধ করা, জমির দাম বেঁধে দেওয়া এবং তারই সঙ্গে এই ঘোষণা করা যে, কোন্‌ জমি কি ভাবে ব্যবহৃত হবে তা কেন্দ্রীয় পুনর্গঠন সংস্থার অনুমোদনক্রমেই শুধু স্থির করা যাবে। আর এই সঙ্গেই পুনর্গঠন সংস্থার তরফ থেকে এই অঞ্চলের প্রতিটি জমিখণ্ডের ব্যবহার কিভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় তা বিশদভাবে গবেষণা করে স্থির করা আবশ্যক। এই অঞ্চলের বহির্ভূত কোনো স্থান থেকে স্থায়ীভাবে কোনো লোক এসে বাস করতে চাইলে তা সংস্থার অনুমতিক্রমে করতে হবে। আর এইসব নিয়ম প্রচলনের সঙ্গেই প্রধান কাজ হবে, এই অঞ্চলের সর্বত্র কিভাবে স্থানীয় লোকদের বাড়িতে বসে বা নিজ শহরে ও গ্রামে রোজগার সম্ভব হয়, তার ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাবটি যত সহজে লেখা গেল, তত সহজে করা যাবে না। আপত্তি

উঠবে, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের যে মূলনীতি (fundamental rights) আছে, তার সঙ্গে এই ব্যবস্থা খাপ খাবে না। প্রতিটি জমির উচিত ব্যবহার নির্ধারণ করার জন্য সরকারের তরফে যে ব্যবস্থা করা হবে তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হবে; ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে জমিবণ্টন-ব্যবস্থা সরকারের হাতে এলে একদিকে আমরা যেমন গণতান্ত্রিক কাঠামো জলাঞ্জলি দেব, অপরদিকে অনিবার্যভাবে সরকারী ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রবেশ করবে, ফলে আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। এ কথাও হবে যে, যে শহরে-সমস্যা কয়েক বর্গমাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে, তার বিষক্রিয়া এই ব্যবস্থায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সমস্ত অঞ্চলটি জুড়ে, অথবা হয়তো কলকাতাকে কেন্দ্র করে ষাট-সত্তর মাইল ব্যাসের মধ্যে যে-সব রেলপথ বা রাস্তা আছে তারই দুইদিকে বৃহত্তর লণ্ডনের মতো শহর গড়ে উঠবে; অন্যান্য প্রদেশ থেকে ধনশালী লোকেরা এসে হাজির হবে আর স্থানীয় লোকেরা আরো দূরে হটে যেতে বাধ্য হবে। আরেকটি সমালোচনা এই হবে যে, বৃহৎশিল্পের যে ঘন সমাবেশ এই অঞ্চলে থাকার দরুন আজ এখানকার সমৃদ্ধি, তা অচিরে ব্যাহত হবে।

প্রতিটি আপত্তিই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু এর বিকল্প প্রস্তাব কি হলে আমরা বর্তমান অনির্দিষ্ট-যাত্রা বন্ধ করতে পারব?

একদিকে সরকার তাঁদের পুনর্গঠনের কাজ নিয়ে এগোবেন, অপরদিকে ব্যক্তিগত বা দলগত মুনাফার জন্য জমির স্বাধীন ব্যবহার অব্যাহত থাকবে? তাহলে শেষ পর্যন্ত জমির দামই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর 'আধুনিক' নগরীরই বা কি রূপ দাঁড়াবে?

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি।

"জমি যদি খোলাবাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার টাকা আছে, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই।…এ কথা বলতে ইচ্ছে করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য।…আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া।"—'রায়তের কথা', আষাঢ়, ১৩৩৩

কবির এই উক্তি, আজও, যখন জমিদারি উঠে গেছে এবং সরকার জমির মালিক হয়েছেন, এখনও বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ।

সুখের কথা জমির দাম ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সরকার ইতিমধ্যে সজাগ হয়েছেন। West Bengal Town and Country Planning Legislation Commission এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ করে বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেছেন। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে এ-বিষয়ে সরকার আরো অগ্রণী হয়েছেন; আমেরিকার মতো ধনতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রধান দেশেও ধনোৎপাদনের মূল উপাদানগুলি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে রাখবার যে প্রয়াস প্রথম টেনেসি ভ্যালি করপোরেশন গঠনের সময় অনুভূত হয়, তারই পুনর্নিয়োগ দেখতে পাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, মূল্যবান রসদপত্র ফুরিয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা যাওয়াতে।

আজ যখন আমরা 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' তৈরি করছি, 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগঠনের কথা ভাবছি, কয়লা উৎপাদন রাষ্ট্রের তরফে নিয়ন্ত্রণের করার ব্যবস্থা করছি, অন্যান্য মূল্যবান দুর্লভ ধাতব সম্পদ রপ্তানির কাজ ব্যক্তিগত মুনাফার এখতিয়ারে ছেড়ে রাখছি না, তখন কলকাতার মতো স্থানে, জমির মতো মূল্যবান সম্পদ নিছক ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ছেড়ে দিই কি করে?

এ কথা ঠিক যে প্রয়োজনমতো যে-কোনো জমি বা বাড়ি সরকার 'উপযুক্ত' মূল্য দিয়ে দখল নিতে পারেন, নিচ্ছেনও। কল্যাণী, পাতিপুকুর, সল্ট লেক, অঞ্চলে জমি বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের যে কাজ চলছে, তা যৎসামান্য হলেও বাঞ্ছিত পথের সূচনা করছে। জমিদারি প্রথা লোপ পাবার পর, গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক তো সরকারই হয়েছেন; আমাদের তাহলে দুশ্চিন্তার কারণ কি? যাঁরা 'ল্যাণ্ড-অ্যাকুইজিশন' পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত আছেন এবং গত কয়েক বছরের জমি ব্যবহার ও হস্তান্তরের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা বলতে পারবেন আমাদের প্রস্তাব কার্যকর হতে আরো কতটা বাকি রয়ে গেল।

গণতান্ত্রিক দেশে জমির মতো স্থাবর সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করার সূত্রে নানান প্রস্তাব হতে পারে। কেউ বলবেন জমির ট্যাক্সের তারতম্য ঘটিয়ে একপ্রস্থ জমি-ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। চরমপন্থীরা জমি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তাব দেবেন, আর বলবেন কে জমি ব্যবহার করতে পারবে, কত মূল্যে জমির দখল নিতে পারবে, সবই রাষ্ট্র ঠিক করে দেবে।

এই দুই পদ্ধতির মধ্যবর্তী পন্থা কি হতে পারে সেইটিই সরকারকে ভেবে স্থির করতে হবে; জমি হস্তান্তর ও ব্যবহারের পরিবর্তন, এবং জমির মূল্য, এই যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যেতে পারে।

আশঙ্কার কথা এই যে যতই নিয়মাবলী হবে, ততই তার ফাঁক বার করা করা হবে ; আমরা গত পনেরো বছরে এই কাজে বিশেষ পারদর্শী হয়েছি। জমি হস্তান্তর হবে বেনামীতে, রসিদে যে টাকার উল্লেখ থাকবে তার উপরেও 'কালো' টাকার লেনদেন হবে। এ কথার অর্থ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে রাষ্ট্রের তরফে যাঁরা জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাঁদের কার্যকলাপ সংশয়ের ও সমালোচনার অতীত হতেই হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু, সৎ, স্বচ্ছ ও নির্ভীক না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত সব কাজের মতোই এই কাজও ব্যর্থ হবে।

তার পর প্রশ্ন উঠবে, বৃহৎ কারখানা আর বসতে না দিলে দেশের সম্পদ আসবে কোথা থেকে? এখন যেসব কলকারখানা আছে তাদের তো তোলা হচ্ছে না, তাদের সম্প্রসারণও বর্তমান আইন অনুযায়ী যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেইভাবেই করা হবে। নতুন কারখানা বসাতে হলে এখনো কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে ঠিকই ; কিন্তু মনে হয় সেই ব্যবস্থাতে সামগ্রিকভাবে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের লোকবল, বাসস্থান, জলের ব্যবস্থা, এই সব মিলিয়ে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় না। ইংলণ্ডে, যতদূর শুনেছি, নতুন কারখানা বসাবার আগে আরো বিশদভাবে সব দিক বিবেচনা করে দেখা হয়।

কলকাতা শহর লুনর্গঠনের প্রারম্ভিক পর্বে আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে ; পাশ্চাত্ত্য শহরের ব্যর্থ অনুকরণ করতে চেষ্টা করে, 'modernize' করতে চাইলে আমরা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারব না। সম্প্রতি কলকাতা পুনর্গঠন নিয়ে যে আলোচনা হয়ে গেল, তাতে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পপুলেশন স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর ড চন্দ্রশেখর বলেছেন "Calcutta is choked." সমাধানের প্রস্তাব হিসাবে তিনি বলেছেন—"depopulate", "decentralize", "deindustrialize"। এই সূত্রে লুই মাম্‌ফোর্ডের উক্তিও উল্লেখযোগ্য :

"Many things that were done hastily in the nineteenth century—because there was in a sense no time to think—now have to be done over again..." "Population that spread with no more social direction than the surface tension which gives definition to an ink blot, must be re-grouped and nucleated in

a fashion that will make possible on co-operative civilized life...." "Rural regions will attract industry, foster a co-operative way of life, promote biotechnic urbanism : while industry must, for the sake of life-efficiency, seek a wider rural basis. Each village nucleus will thus be the embryo of a modern city, not the discouraged, depauperate fragment of an indifferent metropolis···"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে যে কথা বারবার বলে গেছেন, বিনোবাজী এখন যা প্রচার করছেন, এই সব কথার সঙ্গে উপরোক্ত বক্তব্যের পার্থক্য খুবই সামান্য।

কলকাতার ক্ষেত্রে এই সব বক্তব্য কি ভাবে প্রযোজ্য হবে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে তাঁদের, যাঁরা বর্তমানে সমগ্র দেশের অর্থনীতিকে গড়ছেন। এর জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন সেই প্রস্তুতি কি আমাদের আছে? উত্তরে এই কথা বলা যেতে পারে, গ্রামাঞ্চলে আমরা ইলেকট্রিসিটি নিয়ে যাচ্ছি, রাস্তাঘাট ভালো করে দিচ্ছি, কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতি করবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছি, তাতেই তো সুফল হবে, শহর ও গ্রামের বৈষম্য ঘুচে যাবে ; তারপর আমরা যদি কলকাতা শহরকে 'মডার্ন' করি তাহলে তো কিছু ক্ষতি হবে না। গত পনেরো বছরে পল্লী-অঞ্চলের উন্নতির যত চেষ্টা হয়েছে তার মোট ধারাটি লক্ষ্য করলে, এবং ইওরোপ-আমেরিকায় যে সমস্যা নতুন করে ভাবতে হচ্ছে তার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখব যে ধন কেন্দ্রীভূত হবার যে ব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গেঁথে রয়েছে, তাকে পাকা করে গাঁথা হচ্ছে শহরেই, এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

একথা ঠিক যে বৃহৎশিল্প যেমন ইচ্ছা বিকেন্দ্রীকরণ করা আজকালকার দিনে সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয় এবং বৃহৎশিল্প যতই কেন্দ্রীভূত থাকবে, তার আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলিও অপরিহার্য বলে ধরে নিতে হবে। বাংলা দেশের লোক সংখ্যা অত্যধিক, চাষের জমির পরিমাণ অল্প ; কলকাতায় যে পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হয়েছে, তাকে কাজে লাগাতেই হবে ; শিল্পবিকেন্দ্রীকরণ যতই হোক-না কেন, কলকাতাকে কেন্দ্র করে যত লোক জমা হয়েছে, সেই জনসংখ্যার চাপ কমানো সম্ভব হবে না আদৌ।

অতএব এই মহানগরীর পরিধি ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের অঞ্চল যাতে আর বৃদ্ধি না পায়, সর্বপ্রথম সেই ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন; এবং এই স্বল্পপরিমাণ স্থানের মধ্যে যত লোক আছে তাদের জীবনযাত্রা যাতে সহনীয় হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য একদিকে যেমন অন্যত্র শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে, সেই সঙ্গে এই মহানগরী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমির হস্তান্তর, মূল্য ও ব্যবহার কঠোরভাবে ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, তা না হলে দ্রুত যানবাহনের দ্বারা যুক্ত স্থানগুলিতে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কলকাতার উদ্বৃত্ত লোকদের বাসস্থান হবার পূর্বেই ঐ সব স্থান এখনকার উপনগরীগুলির মতো এলোমেলো ভাবে ভরতি হয়ে যাবে।

এ সত্বেও, বলা বাহুল্য যে যতদিন না পল্লী-অঞ্চলের লোকেরা তাদের নিজেদের স্থানে বসে রোজগার করার পথ খুঁজে পাবে, ততদিন শহরের আকর্ষণী শক্তি কমবে না। জমির মূল্য ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেই উৎপাদন-ও বণ্টন-ব্যবস্থা শহর ও গ্রামে যুগপৎ সমবায়নীতির দ্বারা পরিচালনা এবং ব্যাপক ইলেকট্রিসিটি প্রসারের সঙ্গে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের প্রচলন ইত্যাদির সাহায্যে এই দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করতে হলে যা করণীয় বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশদ আলোচনার স্থানাভাব।

'মাস্টার প্ল্যান' তৈরি হবার উদ্যোগপর্ব চলছে, এই সূত্রে সম্প্রতি এক সেমিনারে এক বিশেষজ্ঞ যে কথা বলেছেন সেটি উল্লেখ করে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করব:

"Let us not make bigger mistakes to correct minor ones. Master Planning must be based on sanity. It must fit in to the philosophy and objectives people cherish."

আমেরিকার মতো প্ল্যানিং-প্রধান দেশেও এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে:

"It is startling to note how many wasted plans are developed without reference to the locality's financial ability for carrying them out…" "Much has been written about *Planning for People*, but there is a strong possibility that some planning may reflect more of the values of the city planners themselves than those of the people of the community."

রূপনারানের কূলে

গোপাল হালদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

[২]

শ্রুতি ও স্মৃতি

জাতিস্মরদেরও স্মৃতির সীমানা আছে। দু-একটা বিষয়ে শ্রুতিই তাঁদেরও গতি—যেমন, জন্মের স্থান, সময়। পূর্বজন্মের কথা নিজের মুখেও বলা যায়, এ জন্মের কথা পরের মুখেই শুনতে হয়। আরেকটা কথা নিশ্চয় সত্য—প্রত্যেকেরই স্মৃতির প্রথম উৎস পরিবার-পরিবেশ। তা ক্রমেই পিছনে পড়ে যায়, কিন্তু সকল আদানপ্রদানের পিছনেও থাকে। হয়তো জমে থাকে অচেতন মনে। জীবনের শেষ সীমানায় পৌঁছে কতজনার দেখা যায় সেই প্রথম দেখা, প্রথম শোনা, প্রথম জানা কথাই আবার ভেসে উঠছে বিস্মৃতির তলা থেকে।

শ্রুতি বলেন, আমার জন্ম যেখানে সে গ্রাম নেই। সেখানে এখন পদ্মা নদী। আবার, আশৈশব আমি যেখানে কাটিয়েছি সে (নোয়াখালি) শহরও নেই। সেখানে এখন মেঘনা নদী। আমার জন্ম পৈত্রিক ভদ্রাসনে—'বিঁদ্‌গাঁও' গ্রামে। ওই 'বিঁদ্‌গাঁও' কথাটি আমার পিতার রচনা। ১৯২১-এর পরে তিনি মুখের রসিকতায় মনের ব্যথাটা ওভাবে চাপা দিতেন: "সাং হাল ?—স্বর্গীয় বিদ্‌গাঁও, জিলা ঢাকা।" আমার জন্মের ১৯ বৎসর পরে তার পদ্মালাভ হয়। কারণ, আমার জন্ম তারিখ শুনেছি ২৮শে মাঘ, ১৩০৮ বাং, ইংরেজী হিসাবে সম্ভবত ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০২। অন্তত আমি ওই দিনটাকেই মানি। কিন্তু জন্মক্ষণ মানতে অসুবিধায় পড়ি। বড় গ্রাম বিঁদগাঁও, গ্রামে শিক্ষিত মানুষও বেশ ছিল, আমাদের বাড়িতেও তার অভাব ছিল না। কিন্তু আমি যখন জন্মালাম তখন পাড়ায় একটা ঘড়ি পাওয়া যায় নি। গ্রামবৃদ্ধরা সময় ঠিক করলেন—কতক্ষণ পূর্বে কোড়াল পাখি ডাক দিয়েছিল! তাদের অনুমান মতো আমার কোষ্ঠী রচনা করিয়েছিলেন পরিবারের কর্তা। তিনিই

তা নষ্ট করে ফেললেন। ওরকম সময়ে জন্মে তাঁর পরম স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ সহোদরের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বাঁচবার কথা নয়। আমি কিন্তু বেঁচে রইলাম—সম্ভবত প্রবীণদের অনুমান অগ্রাহ্য করে, আর দৈবজ্ঞদের গণনাও অগ্রাহ্য করে। নিশ্চয়ই ক্ষণজন্মা, অর্থাৎ অনাসৃষ্টি। আরও একজনাকে বোধহয় আমি পরাহত করেছি। বিধাতা আমাকে দিতে চেয়েছিলেন কোকিলের কণ্ঠ আর ময়ূরের রূপ। যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, অপরিচিতদের জন্যই তাই বলছি—তাঁর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে আমি পেয়েছি ময়ূরের কণ্ঠ আর কোকিলের রূপ। 'গড্‌স্ হ্যাট ফেল্‌ড্‌' আমার কাছে একটুও নতুন কথা নয়। গড্‌সদের ফেল করাই তো নিয়ম, কারণ মানুষ বাঁচতে জানে। আমার অন্তত ৬১টি বছরের আয়ুটা তারই সাক্ষী।

স্মৃতির প্রথম প্রকাশ যে পরিবার ঘিরে তার মধ্যে পিতার ছাপটা প্রথম নয়। কিন্তু তাঁর কথাটা প্রয়োজনে প্রধান। বৎসর দশ হলো, ছাত্রদের জন্য রচনা-শিক্ষার একখানা বই আমাকে লিখতে হয়। তাতে একটি রচনা-বিষয় ছিল 'আমার আদর্শ মানুষ'। রচনার আদর্শ হিসাবে আমি যা লিখেছিলাম তা দেখে বহু-অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক-পরীক্ষক বইটাকে বাতিল করে দেবার পরামর্শ দেন প্রকাশককে। প্রকাশক সদব্যবসায়ী। বছর তিন পূর্বে কিন্তু একটা রচনার বইতে সে লেখাটা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। এ প্রকাশক সদাশয়। রচনাটি তাতে একটু সংক্ষিপ্ত করেছি অক্ষরের মাপে। শেষে বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য যোগ করে শিক্ষার্থীদের জানিয়েছি—কি করে রচনা লিখতে হয়, আর ওরূপ রচনাও কেন তারা লিখবে না। ছাত্রদের উপলক্ষ করে লেখা বলে লেখাটা 'সাধু ভাষায়'। জন্মের স্থান ও তারিখের সঙ্গে এই অসাধু স্মৃতিকথায় আর-একটু ঠিকানা দিয়ে রাখি—'আমার আদর্শ মানুষ'কে সেই সাধু বচনে উদ্ধৃত করে :

"শৈশবের কথা মনে পড়ে—তখনও পৃথিবীকে চিনিয়া উঠি নাই। সেই সময়ে আমার চক্ষে আমার আদর্শ মানুষ ছিলেন আমার পিতা। কত বড় তিনি দেখিতে, কত শক্তিমান তাঁহার দেহ, কত আশ্চর্য তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কত মহৎ তাঁহার হৃদয়। একবার তাঁহার আশ্রয় পাইলে আমার আর কোনো ভয় থাকিত না। আমার শিশুমন তাঁহার অপেক্ষা বড় করিয়া কাহাকেও ভাবিতে পারিত না। আমার প্রথম প্রস্ফুটিত চক্ষুর সম্মুখে তিনিই ছিলেন আদর্শ মানুষ।

"তারপর শৈশব ছাড়িয়া বাল্যে প্রবেশ করিতেছি, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেছি। আমার চক্ষে তখন আদর্শ-স্থানীয় হইয়া উঠিলেন আমার দাদা। আমার অপেক্ষা বয়সে তিনি বেশি বড় নহেন, এক ক্লাস উপরে পড়েন। একসঙ্গে আমরা খেলিতাম, স্কুলে যাইতাম, বাড়ি ফিরিতাম। কিন্তু এইসব কথা প্রতি মুহূর্তে বুঝিতে পারিতাম যে, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থানীয়। সত্যসত্যই খেলায় তাঁহার জুড়ি ছিল না, পড়ায়ও তিনি ছিলেন বেশ ভালো। তাঁহার খেলার নিপুণতায় ও বুদ্ধিকৌশলে অনেকের মত আমিও চমৎকৃত হইতাম। অনেকের মতই আমি তাঁহাকে মনে করিতাম আমার আদর্শস্থানীয়—ক্রীড়া কৌশলের জন্য ও বুদ্ধি-উৎকর্ষের জন্য।

"তারপর সেদিন গেল। তাঁহার ও আমার কৈশোর নূতন চেতনায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। আমাদের সেদিনের চক্ষের সম্মুখে প্রাণবান অগ্নি-শিখার মত প্রকাশিত হইলেন বিবেকানন্দ। তাঁহার সাধনার বাহক হিসাবে তখন বেলুড় মঠ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 'দরিদ্র নারায়ণের সেবায়' দেশের প্রত্যেকটি কোণে অগ্রসর হইতেছে। উহা যেন কর্মযোগের এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। সেই কর্মযোগের সুমহৎ প্রেরণার উৎস স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি বিদেশে আমাদের ধর্ম ও সভ্যতার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি স্বদেশে আপনার দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন এ-যুগের এই 'দরিদ্র নারায়ণের সেবার মন্ত্র।' যিনি পৃথিবীর ধর্মসভায় আমেরিকার নরনারীকে অকুতোভয়ে সম্ভাষণ করিতে পারেন 'My sisters and brothers of America." বলিয়া। আবার স্বদেশের মানুষকে জলন্ত ভাষায় প্রবুদ্ধ করিতে পারেন এই আহ্বানে "ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি-মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

"খুব বেশি কিছু বুঝি নাই তাহা সত্য, বিবেকানন্দকে আদর্শ মানুষ মনে করিয়াছিলাম সন্ন্যাসীর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার বশে নয়। হয়ত তাহা ছিল, কিন্তু আমরা দেখিয়াছিলাম তাঁহার অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। দেখিয়াছিলাম তাঁহার ভারতীয় নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা; সর্বমানবের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ। আর দেখিয়াছিলাম তাঁহার প্রবল স্বদেশানুরাগ ও ভারতীয়

সাধনার প্রতি আন্তরিক মমতা। কিন্তু সর্বোপরি বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা পাইয়াছিলাম দুইটি যুগসত্য: সেবাধর্মের আদর্শ ও বীর মন্ত্র—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।" মিসেস বেণ্টের ভাষায় বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলাম সন্ন্যাসী নয়, যোদ্ধরূপে। ভারত-উদ্ধারের বিপ্লবী সাধনায় সেদিন বিবেকানন্দ আমাদের মন্ত্রগুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন—এই সব কারণে।

"অনেকদিনেও এই আদর্শ মানুষের মূর্তি আমাদের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গেল না। কারণ, জাতির জীবনসংগ্রাম হইতে দূরে বসিয়া যাঁহারা ধ্যান বা সাধনা করেন তাঁহাদের মূর্তি আমার হৃদয়স্পর্শ করে নাই। কালধর্মের নিয়মে কিন্তু ভারতের জীবনাকাশে ক্রমে প্রস্ফুট হইলেন আর এক কর্মযোগী—গান্ধীজী। তাঁহার অহিংসার মন্ত্র ও তাঁহার সত্যাগ্রহের মর্যাদাময় কর্মপন্থা এক অদ্ভুত সাধনা। গান্ধীজীকে দেখিয়াছি। তাঁহার দৃঢ় পণ ও প্রতিজ্ঞাও দেখিয়াছি শেষ বয়সে নোয়াখালিতে, উহার তুলনা নাই। আর তাঁহার চরম বিজয়গৌরব দেখিয়াছি তাঁহার অমর জীবনাবসানে। কিন্তু তাঁহার জীবন-কালেই দেখিয়াছি তাঁহার চারিদিকে আদর্শহীন ও আদর্শভ্রষ্ট নর-নারী তাঁহারই নাম ও তাঁহারই মন্ত্রের আড়ালে কত আশ্রয় পাইয়াছে। অহিংসা ও ত্যাগ মন্ত্র কেমন করিয়া শেঠ ও বণিকদের লুণ্ঠনকেই স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমরা গান্ধীজীর নিকটে আপনাকে উজাড় করিয়া দিতে পারি নাই। হয়ত এই কারণেই সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যতটা পারিয়াছিলেন পণ্ডিত জহরলাল বা অন্যান্যরা।

"হয়ত এই কারণেই আবার সুভাষচন্দ্রকেও আমরা তখন এতটা আমাদের আদর্শস্থল করিতে চাহিয়াছি। সুভাষচন্দ্রই বিবেকানন্দের উত্তর সাধক; আর সেই হিসাবে তিনিই আমাদের আদর্শস্থানীয়ও। এই যুগের ভারতবর্ষে বহু নেতার বহু সদগুণের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু অন্তত তিনটি জিনিসের জন্য তাঁহাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র অতুলনীয়—এমন জ্বলন্ত দেশপ্রেম, এমন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বুকভরা বিক্ষোভ, আর এমন সত্যকারের দৃঢ়ব্রত পুরুষ এই কালের ভারতবর্ষে আর কয়জন আছেন, জানি না। যিনিই থাকুন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় অন্য কেহ এমন অগ্নিশুদ্ধ হইয়া সমুত্তীর্ণ হইতে সাহসী হন নাই। ভারতের কোন মানুষকে যদি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত তাহা হইলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেই সেই পদে বরণ করিতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"কিন্তু রাজনৈতিক নেতার পক্ষে একটি প্রধান গুণ হইল অভ্রান্ত রাজনৈতিক চেতনা। সেই কারণে ইতিপূর্বেই আমাদের অন্তরে উদিত হইয়া সমাসীন হইয়াছিলেন আর একজন মহামানব—তিনি লেনিন।

"বুদ্ধ নন, খৃষ্ট নন, শ্রীচৈতন্য বা গান্ধীজীও নন,—আশ্চর্য কথা, আমার চক্ষে আদর্শ মানুষ হইলেন লেনিন। কেন? কারণ, মানুষের মনে তিনি চিরসংগ্রাম ও চিরজয়ের আশা জ্বালিয়া দিয়াছেন। মানুষ আর কিছুতেই ছোট হইয়া থাকিবে না, পরাজয় মানিয়া লইবে না। আত্মশক্তির এমন সন্ধান তিনি ক্ষুদ্রতম মানুষের মধ্যেও আনিয়া দিয়াছেন যে, তাহারই তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া কবিকিশোরও সগৌরবে জানে—"আমিই লেনিন।" ইহাই লেনিনের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সত্য। অথচ চালচলনে লেনিন ছিলেন সাধারণ মানুষ—অসাধারণ মানুষও যে সাধারণেরই মতো, এই সত্যের যেন তিনি প্রমাণ।

"সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অসাধারণত্বের বীজ এবং অসাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণত্বের চিহ্ন—ইহাই বুঝিতে বুঝিতে, আবিষ্কার করিতে করিতে যখন আজ জীবনের ক্ষেত্রে অনেক দূর আসিয়া গিয়াছি, তখন নিজের অন্তরের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—সেখানে কখন আমার মনেরও অগোচরে আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন আবার আমার জীবনের সেই প্রথম আদর্শ—আমার পরলোকগত পিতৃদেব। অসাধারণ বলিয়া কেহই তাঁহাকে জানিত না; কিন্তু 'সাধারণ' বলিলেই কি তাঁহার কথা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি? শিক্ষিত বাঙালি তিনি; ভদ্রপরিবারে জন্মিয়াছিলেন; দশজন মধ্যবিত্তের মতো বিদ্যার্জন করেন, তারপর সংসারে প্রবেশ করেন। আপনার পরিশ্রমে কর্ম-ক্ষেত্রে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠাও কিছুটা অর্জন করিয়াছিলেন। দশজনকে খাওইয়াছেন, পরাইয়াছেন, মানুষ করিয়াছেন। দশটা সৎকার্যে সাধ্যমত সাহায্যও করিয়াছেন। কিন্তু বিরাট কিছু করেন নাই। ভদ্রতা, শোভনতা, সম্ভ্রমবোধ, সবশুদ্ধ একটা সংযত সুন্দর জীবন ছিল তাঁহার। আজ মনে হয় জীবনের সকল দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ভালোমন্দ সুদ্ধ এই জীবনকে এমন সরস ক্ষমাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যিনি দেখিয়া গিয়াছেন—সেই সাধারণ মানুষই আমার আদর্শ মানুষ।

আসলে কথাটা বুঝিতেছি—জীবনের কর্মক্ষেত্রে যে আপন কর্তব্যটুকু স্বচ্ছন্দ আনন্দে উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছে সেই সাধারণ মানুষই তো আদর্শ মানুষ—সমাজ সভ্যতার তাহারাই তো প্রাণ।"

এ আদর্শ মেনে নিতে সময় লাগে। আমার লেগেছে। আদর্শ ছাড়তে ছাড়তে চলেছি, মানুষকে এগিয়ে যেতে হয় আর মানুষকে বুঝতে বুঝতেই এগুতে হয়। ততদিন আদর্শ নিয়ে কিছু ঝুটোপুটি করেছি। এ মানুষকেও বুঝতে হয়েছে। আমার কাছে আমার পিতার সমগ্র রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর মৃত্যুর কালে। ১৯৩২-এর ২৮শে মার্চ কলকাতায় তিনি আমাদের ছেড়ে যান। তখন বোধহয় তাঁর বয়স বাষট্টি বৎসর। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হলো। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা চলে চেতন-অচেতন অবস্থায়, বাঁচার প্রাণপণ সংগ্রাম। তারপর শান্তি। কারণ তাঁর মুখে তখন লেগে রইল একটি প্রশান্ত হাস্যরেখা। ডাক্তারবাবু, আত্মীয়, যিনি দেখছিলেন তিনিই তা উল্লেখ করছিলেন। তাই তাঁর শেষ রূপ।

ঘরে ছিল তখন একটা পুরনো টাইপরাইটার। দুই দিন তার ওপরে আঙুল চালিয়ে আমি কয়েক পৃষ্ঠা স্মৃতিকথা লিখে রেখেছিলাম। প্রায় পনের পৃষ্ঠা পাতলা ফুলস্কেপ কাগজে। মানুষটির ছবি না হোক্ কিছু ছাপ থাক্। লেখাটা ইংরেজিতে। আসলে টাইপরাইটার-এর টানেই হয়তো লিখেছিলাম, না হলে লেখাই হতো না। বাঙলায় তা এখানে কিছুটা তুলে দিচ্ছি। সমস্তটা দেওয়াও যেত। কিন্তু সম্পাদকের তাতে আপত্তি হবে ; পাঠক করবেন বিদ্রোহ।

“বাবা চিরনিদ্রিত। শেষশয়ানে তাঁর মুখে লেগে রয়েছে একটু মৃদু হাস্যরেখা। এ কয়ঘণ্টা বাঁচবার কী দারুণ চেষ্টাই না করছিলেন।…কিন্তু যখন সংগ্রাম শেষ হলো তখন প্রশান্ত মুখে জেগে আছে সেই প্রসন্ন হাসি, অর্ধ-নিমীলিত চোখে সেই চিরদিনের স্নেহ-সুন্দর দৃষ্টি।” কঘণ্টা পূর্বেকার সেই দুঃসহ প্রাণপণ প্রচেষ্টা—আর এখন এই প্রশান্তি, কী তার অর্থ। মৃত্যু কি পরাজয়, না, জয় ?—আমি তো ওঁর উত্তর বুঝে উঠতে পারব না।

ঘটনাবহুল নয় ওঁর জীবন। চমক লাগানো তো নয়ই। দেশের রাজনৈতিক বা বুদ্ধিজীবীর সমাজে তিনি কোনো আলোড়ন তোলেন নি। সেরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ছিল না। যে ছোট শহরে জীবন তিনি যাপন করেছেন সেখানে সবই শান্ত, মৃদুগতি, নিস্তরঙ্গ! তারই মধ্যে তিনিও খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। ‘প্রধান’ হতে চান নি, ‘প্রথমও’ গণ্য হতেন না। নিজের সহজ

স্বচ্ছন্দ ধারায় কাটিয়েছেন, সহজভাবেই হয়ে গিয়েছিলেন দশজনের একজন। সূর্যের আলোর মতো শুভ্র স্বচ্ছন্দ, সে শুভ্র আলোক ছড়িয়ে পড়েছে দশ-জনের জীবনে সহজে। প্রায় বিশ বৎসর তিনি ওকালতি করেছেন—আইনজ্ঞ বলে তাঁর নাম ছিল। সে নাম মিথ্যা নয়। অকারণও নয়। আইনের বই পত্র-পত্রিকায় তাঁর ঘর ভরা। নতুন নজির চোখ এড়িয়ে যেত না। অনেক রাত্রি জেগে তা পড়তেন তবে ঘুমুতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতেন অনেক দেরিতে। এই বিলম্বিত শয্যাত্যাগ ছিল বন্ধুদের রঙ্গতামাসার বিষয়। “তুমি জীবনে জানলে না—সকালে ওঠা কী সুখের”। তাঁর হাকিম সহপাঠী তাঁকে একবার বললেন। তিনি উত্তর দিলেন, “জানি কখনো কখনো। ছেলেরা শেষরাত্রির গাড়িতে বাড়ি আসে উঠে পড়ি, আর ঘুমোই না। তুমি কিন্তু জীবনেও জানলে না বেলা ৯টা পর্যন্ত ঘুমোনো কী সুখের”। জুনিয়ররা পরামর্শ চাইলে তিনি বলতেন : “জানো তো ল হচ্ছেন রাধিকা সুন্দরী এক আধ মণ তেল না পুড়লে এ-রাধা নাচেন না। নিশীথ রাত্রির তেল পোড়াও”। তিনি বলতেন : “উকিলের জীবন বাঘের জীবন। প্রথম দশ বৎসর বাচ্চা, সবার হাতে মার খায়। দিন কষ্টে কাটে। তারপর সে বাঘ—মাঝের দশ বৎসর। আর শেষের দশ বৎসর আবার গলিত নখদন্তনয়ন—সবাই ভেংচি কাটে।” ভাগ্যক্রমে তার আগেই তিনি ওকালতি ছেড়ে দেন। শরীর খারাপ হচ্ছিল—বহু জমিদার তাঁদের উকিলকে চাইলেন ম্যানেজার রূপে।

আইনের বই ছিল তাঁর রোজকার খাদ্য পানীয়। তবে একমাত্র খাদ্য নয়।

বই তিনি ভালোবাসতেন, পড়তেনও সব বই। এমন কি কিনতেনও অনেক বই। বাঙালা বইও কিনতেন। রবীন্দ্রনাথ বাদ যেতেন না, অন্যেরাও গ্রাহ্য হতেন। অথচ তিনি তো ধনী ছিলেন না। বৃহৎ পরিবারে তিনি প্রধান রোজগেরে পুরুষ। বিদ্যা ফলাবারও তাঁর সময় হতো না। ওকালতি বড় ‘জেলাস মিস্ট্রেস’ তবু সাহিত্য পড়তেন। বোধহয় ‘কালচার’-এর প্রতি অনুরাগ ছিল (‘সংস্কৃতি’ কথাটা তখনো জন্মায় নি।) আর্নল্ডীয় অনুরাগ শুধু নয়, ওয়েল্‌সীয় ঔৎসুক্যও ছিল। পুরনো দেবতাদের ভক্তি করতেন। নতুনদেরও আদর করতেন। হার্ডির ‘রিটার্ন অব দি নেটিব’ ভালো লাগত। শ’র ‘সেন্ট জোয়ান’ উপভোগ করতেন ‘ব্যাক্ টু মাথুসেলা’র মতো। সিলভেস্টার বনার্ড’ ভালো লাগলেও খুশী হতেন ‘রিভোল্ট অব দি এঞ্জেলস’-এ।

তলস্তয়, দস্তয়েভস্কিও ছিল সমাদৃত তবে ডিকেন্স, থ্যাকারের মতো নয়।

'পড়া' তিনি বলতেন দু-রকমের। একটা 'দেখা'। আমাদের পড়ার নমুনা দেখেই বলতেন—"এ হচ্ছে দেখা"—দেখে গিয়েছি চোখে পড়েছে হয়তো মনে আবছা হয়ে আছে। কিম্বা নেই। কিন্তু 'পড়া' নয়। পড়া হচ্ছে অধীত করা, আয়ত্ত করা—মনে, বুদ্ধিতে—ভুলবে কি করে? ওদের কালে তাই ছিল 'পড়া'! সে হচ্ছে বাঙলা দেশের 'অগস্টান্ ঐতিহ্য।' বিদ্যা তখন ছিল তপস্যা। চেষ্টা করে কষ্ট করে তা অর্জন করাই ছিল ধর্ম। ডিক্‌শিনারি মুখস্ত করা ছিল তখন ইংরেজি শেখার পথ। এই সেদিনও তিনি 'পকেট অক্সফোর্ড' পেয়ে তা পড়ে ফেললেন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেক্সপীয়র, মিল্‌টন আবৃত্তি করা ছিল তাঁদের পক্ষে নিয়ম। পড়া বইএর পাশে-পাশে নোট্ থাকত ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে মূলের বিষয়ে পরিবর্তনের কথা। সে সব দিন নেই, বদলে গেছে। তিনি কিন্তু বদলাতে ভুলে গেছলেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলি যখন ১৯১৩-এর গোড়ায় ওঁর হাতে আসে তখন ওকালতির মধ্যাহ্ন। দিনের পর দিন তিনি তা পড়লেন,—বাঙলা 'গীতাঞ্জলি', 'খেয়া' 'নৈবেদ্য' 'শিশু' বা 'চয়নিকা'র, মূল কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে। ইংরেজি অনুবাদের নিচে টুকে রাখলেন মূল বাঙলা বই-এর নাম, কবিতার নম্বর। এখনো সে 'গীতাঞ্জলি' আছে ওর বই-এর আলমিরাতে। তখনো অত বুঝবার বয়স আমার হয় নি—দাদাকে (রণীন হালদার) বললেন, "বৈষ্ণব পদাবলী বলতে পারিস, তার একটু ব্রাহ্ম সংস্করণ। ওরা বলবে বাইবেলের সাম্‌স্"। টান দিয়ে নিলেন বাইবেল।

ইংরেজি বাইবেলের গোটা তিন-চার সংস্করণ ছিল ওঁর হাতে। সে-দিনের অথারাইজড্ ভার্সন্-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছিলেন এ-দিনের ইংরেজিতে নতুন অনুবাদ। কোরানও বাদ যায় নি ইংরেজি অনুবাদে। মহম্মদ আলীর প্রকাণ্ড অনুবাদ সযত্নে পড়েছিলেন। তবে বাইবেলের মতো তা আকর্ষণ করত না। হয়তো বাইবেলের ইংরেজিও একটা কারণ। আর বাইবেলের অপেক্ষাও বেশি আকর্ষণ ছিল 'গীতা'র। গীতার সংস্করণ ছিল তাঁর আরও বেশি—আট-নয়টি। ছোট, বড়, মাঝারি; ইংরেজি অনুবাদও। থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রকাশিত ব্রুক্-এর অনুবাদকে তিনি বেশি প্রশংসা করতেন। তিলকের ব্যাখ্যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদে প্রকাশিত হতেই তিনি তা আনালেন। এখনো তা আছে ঘরে। প্রকাণ্ড বই দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েন। আমাদের

সামনে পরিহাসে বলতেন "ও হচ্ছে বর্গীর গীতা। ওদের কাছে গীতা 'কর্মযোগ' শাস্ত্র।" শ্রীঅরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, "ইনিও জাতীয় নেতা। গীতার অর্থ কি? ওঁর মতে নিছক 'যোগ'। জাতীয়তার এ বাঙালী ভাষ্য। আর তিলক দিয়েছেন জাতীয়তার মরাঠী শাস্ত্র।" গীতা ছিল ওঁর পরম প্রিয়। শেষ আশ্রয়। শিয়রের কাছে বালিশের পার্শ্বে শেষ অবধি ছিল বহু-পঠিত পকেট গীতাখানা।

অবশ্য শুধু 'গীতা' নয়। আর একখানা বইও ছিল, শেষ দিকে পড়ছিলেন। আমার কেনা এইচ্ জি ওয়েল্‌স্-এর 'সায়েন্স অব লাইফ'। তিন খণ্ডে ভালো সচিত্র সংস্করণ। কিছু দিন আগে ও জায়গায় ছিল চার খণ্ডে শেক্সপীয়র। এ বয়সেও আবার তা তিনি দাগ দিয়ে নোট করে পড়ছিলেন—কার জন্য? এ শেক্সপীয়র ছিল চার খণ্ডে, মাঝারি আকারের নতুন। কারণ একটু বড় হরফ ও পরিষ্কার ছাপা না হলে এখন তিনি পড়তে কষ্ট পেতেন।

প্রতিদিন 'পত্রিকা' বা 'ফরওয়ার্ড' পড়া শেষ করে বিরক্ত হয়ে ফেলে দিতেন—'পড়া যায় না'। পড়া অবশ্য তার আগেই হয়েছে। 'পত্রিকা'র কথা বলে বলতেন, "ও বৈরাগীদের কাগজটা সারা গায়ে তিলক কেটেছে—চন্দনের নয়, কালো কালির।" কিন্তু 'স্পেক্‌টেটর' বা 'নেশন এ্যাণ্ড এ্যাথিনিয়ম' —এমন কি 'লিটররি সাপ্লিমেণ্ট'-এ ও তাঁর কষ্ট হতো না। "হরফ ছোট, কিন্তু ছাপার গুণ আছে। আর লেখার গুণও তো কম কথা নয়।" ছাপার গুণটাও শেষ জীবনে বেশি মানতেন। নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে এক বাড়িতে কাটাচ্ছি প্রায় দু বৎসর। নীরদের বতিচেল্লির স্কেচসুদ্ধ পাঁচ গিনির 'দান্তে' আর ষোল গিনির (?) 'জুলিয়ান' শেলি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছলেন। মৃদু হাস্যে অস্ফুট প্রশংসা শুনলাম, 'পাগল'। তাঁদের কালে এ পাগলামির প্রশ্নটা উঠত না। তাঁর কেনা 'টম্ জেম্‌স্', 'পামেলা,' 'ডন্ কুইক্‌সোট্'-ই প্রমাণ। পৃষ্ঠায় দু কলম, করে ক্ষুদে ক্ষুদে হরফ। দু হাত কেন দশ হাত ফিরতি বই। ছাত্রজীবনে কলকাতার যে মুসলমান বিক্রেতার থেকে কেনা তার নাম, ঠিকানা, আর বই-এর দাম সব লেখা আছে মলাটে ভেতরের পৃষ্ঠায়—তিন আনা, সোয়াতিন-আনা দাম। ওসবে তার লজ্জা ছিল না। "আমাদের কালে চার আনা কম পয়সা নয়, বি-এ ক্লাশের ছাত্রের পক্ষে।" অত ক্ষুদে অক্ষর? "এযে ফিল্‌ডিং, রিচার্ডসন, সার্‌ভেণ্টিস্! ক্ষুদে হরফে কি করবে তাঁদের?" সে সব বই-এরও কত যত্ন! বর্ষার শেষে জামা-কাপড়ের মতো একবার

করে রোদে দিতেন, পরিষ্কার ন্যাতা দিয়ে মুছে আবার তুলে রাখতেন, তাকে তাকে সারবন্দি, ঠিক যেমনটি ছিল আগে। সাধ্য কি, সে লাইন্ ভাঙব কেউ। চুরি করে পড়তে গিয়ে প্রথম তো এ-কারণেই আমরা ধরা পড়ে গেলাম। 'মধুসূদন গ্রন্থাবলী' কি করে গেল 'দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী'র পরে? বছর চৌদ্দ বয়স—তখন দাবা খেলার নেশায় পেয়েছে আমাকে। খেলার ডাকে দুপুরে 'জুলিয়াস সীজার' রেখে গেছলাম ওঁর ডেক্সের তলায় বৈঠকখানায়। ভেরিটির টীকাসহ দাদার বই। মনেই ছিল না বিকালে, সন্ধ্যায় এ বই-এর কথা। খেলার মাঠ থেকে ফিরে দেখি—সর্বনাশ। যা ভয় করেছিলাম তাই। ওঁর হাতে পড়েছে। তিনি তা খুলে পড়তে বসে গিয়েছেন। তখনো বৈঠকখানায় ওঁর বন্ধুরা এসে আসর জমিয়ে বসেন নি। এলে বই বন্ধ হলো। চলল নিত্যকার, গল্প, গুজব, আড্ডা—নতুন আইনের নতুন নজির, রাজনীতির নতুন খবর, যুদ্ধের দিনে যুদ্ধের আলোচনা। কিন্তু 'জুলিয়াস সীজার' আগাগোড়া আর একবার টীকা-টিপ্পনী সুদ্ধ শেষ না করে আর তাকে তুললেন না। তার আগে আমারও পরীক্ষা হয়ে গেল—ব্রুটাস ও এণ্টেনিওর বাগ্মিতার তফাৎ কী এবং কেন? পড়ার ঝোঁকে ভাবি নি, এখন শুনলাম।

সে বৈঠকখানা ছিল সেরা ক্লাব। ওঁর আইনজীবী বন্ধুরাই তিন-চার জনা থাকতেন। ছুটিতে দাদা থাকলে তিনিও হতেন একজন। আর তাঁর পিছনে-পিছনে, আমরাও দু ভাই (আমার 'আদর্শ' ভাই প্রফুল্ল হালদার)। ওঁর তাতে অসুবিধা নেই---অন্যদেরও বিশেষ না। কেবল আমরা পড়াশুনা করছি না গল্প শুনছি, এ নিয়ে মাঝে-মাঝে তাড়না দিতেন। তখন আবার পড়ার পৃথক গৃহে আমরা ঠাঁই নিতাম। ব্যাপারটা কিন্তু শহরের ভদ্রলোকরা ভালো চোখে দেখতেন না, পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া! তিনি কিন্তু তাতে আপত্তি দেখতেন না। "তবে কি বাজারে গিয়ে মুদি দোকানে আড্ডা দেবে নাকি?"—দাদার এ-কথায় তাঁরও ছিল সম্মতি। তাই আমাদের কাছে পিতা, পিতৃব্য, পিতৃবন্ধুরা হয়ে উঠেছিলেন অগ্রজের মতো—শুধু সম্মানিত নয়, সুহৃদ্। সেখানে কত কথাই তাই শুনেছি তাঁর মুখে। তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিহাসে উচ্চকণ্ঠের হাসিতে-গল্পে বৈঠকখানা জমে থাকত দিনের পর দিন। আমাদের উপস্থিতি বাধা হতে পারে তাঁদের বন্ধুগোষ্ঠীর গল্পে-রসিকতায়—এ প্রশ্ন উঠতেই পারে নি, আমরাও বুঝি নি তা। তাঁর স্বভাব ছিল এমন যে সর্বদা হাসি মুখে মাতিয়ে রাখতে পারতেন সকলকে—বিশেষ করে

স্বাভাবিক রুচি ছিল এমন স্বচ্ছ রসিকতায়, সরস মন্তব্যে, উদ্ভাবনায়, অকুণ্ঠ আবৃত্তিতে, যা নিচু গলায় বলা দরকার হয় না, যা শুধু বন্ধুদের কাছেই বলা যায় এমন নয়। বই, লেখক, রাজনীতি, সমাজনীতি—সব সেখানে অবাধ আলোচ্য, অবারিত প্রবেশ সকল দেশের মানুষের সকল রকম কথার। সরস অসংকোচ পরিহাস সকল আলোচনায়। কিছুই আলোচনায় বাদ পড়ত না। কিছুই নির্ধারিতও ছিল না। যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁদেরও, যাঁরা অপসন্দ, তাঁদেরও।

রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি আমরা? তিনি তাঁর প্রথম যুগের কবিতা আবৃত্তি করে বললেন—এসব 'সোনার তরীর'ও আগেকার। তাঁদের ছাত্রজীবনের কথা তুলে বললেন: প্রবন্ধ "পাঠ হচ্ছে শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরির সভায়"। তিনি আবৃত্তি করলেন "অভাগিনী ইণ্ডিয়া"। বলে সে প্রবন্ধের আবেগস্পর্শী শেষ অংশ। "তবু সভা শেষ হবে না। সবাই বলেন রবিবাবুর গান হবে—গান! গান! গান।" শেষে গাইলেন রবিবাবু "আমায় বলো না গাহিতে বলো না"। জীবন্ত হলো সেই ছবিটা ওঁর জীবন্ত কণ্ঠস্বরে। আবার আমরা বুঝি রবীন্দ্রনাথ বলতে 'অজ্ঞান'? তিনি আবৃত্তি করলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কিছু। কিম্বা মধুসূদনেরও কিছু—ঋজুতা, দৃঢ়তা আর কল্পনার গভীরতা কিম্বা স্বচ্ছতা, অসামান্য ক্লাসিক গুণ। চাই কি 'কাব্যবিশারদের' সেই ব্যঙ্গ আবৃত্তি করে বললেন—"মিহি কাজই একমাত্র বড় কাজ নয়"। অথচ প্রথম সংস্করণ 'চয়নিকা' পেয়ে তিনি প্রথম কবিতাটিকেই অজস্রবার পড়ছেন। আমার তখন বছর দশ-এগারো বয়স। তাঁর পাশে বসে। বুঝতেই পারলাম না কেন তিনি পাতা উল্টোচ্ছেন না; কেবলি খুলে বসে আছেন "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"। আমাদের ক্ষেপানোও তাঁর উদ্দেশ্য। কাল যাঁকে তিনি বড় করেছেন আবৃত্তি করে গল্প বলে; আজ আমাদের বোকা বানিয়ে তাঁকেই তিনি সিংহাসন-চ্যুত করছেন। তখনো বুঝতাম না—মর্ত্যের মানুষ আর মর্ত্যের জীবন এমনিতর—একই সঙ্গে সাধারণ ও অসাধারণ।

ওঁর যা রুচি—যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মিড-ভিক্টোরিয়ান্' সেই ইংরেজের নয়, সেই বাঙালীর। অর্থাৎ বাঙালী আর্নল্ডীয়ান,—আমাদের কাছে যাঁরা বাতিল। ওই বাতিল-যুগের মধ্যে তিনি সামিল না হোন স-মিল হতে পারতেন। 'টিন্‌টার্ন অ্যাবি', 'দি ন্যাটিং', 'দেয়ার ওয়াজ এ বয়', 'ওড্ অন্ ইন্টিমেশন্‌স অব্ ইম্মর্‌টালিটি', 'ওড টু মিলানকলি", 'টু দি গ্রিসিয়ান্

অর্ন' এ সবের লাইন্ আমরা শুনেছি, শেক্সপীয়র, মিলটন তো অজস্র। কিন্তু 'ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড,' কিম্বা 'প্রমিথিয়াস আনবাউণ্ড' তো শুনি নি—'চাইল্ড হ্যারালড' সামান্য। এদিকের সীমানা রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের চরিত্র-হীন ভালো লেগেছিল—'শেষ প্রশ্ন' কিন্তু বিনা প্রশ্নে বাতিল। রবীন্দ্রনাথকেই কি তিনি ছাড়তেন। 'ঘরে বাইরে' তাঁর কাছে মনে হতো সিকেনিং, ভাবাতিশয্যে। আর 'শেষের কবিতা' ছেলেমানুষের কথার তুবড়ি। পারতাম না আমরা, পরিহাসে তো নয়ই। বার্ক, শেরিডেন, ফক্স্, মেকলে, কেন গ্লাডস্টোনকে আমরা জানতাম বাগ্মিতার গুরু,—ওরা সুরেন্দ্রনাথ লালমোহনের যুগের মানুষ। আমরা অবিরত ওসবের গল্প শুনেছি, বক্তৃতার অংশ শুনেছি আবৃত্তিতে। তাতেও প্রধান রীতি ছিল তাঁর উচ্চকণ্ঠের কথা মন-খোলা হাসি আর এই বুদ্ধি-শুভ্র কৌতুক।

কী তাঁর গুপ্তমন্ত্র যাতে অত জীবন্ত হয়ে উঠত তাঁর বৈঠকখানা হাসি-গল্পে? অন্যের মুখে তো তা অত সজীব হয় না, দেখেছি। ওটাই বোধহয় ব্যক্তিত্বের গুণ। বুদ্ধি তাঁর ছিল, স্মৃতিও ছিল তীক্ষ্ণ, দেশ-বিদেশের বিদ্যায়-জ্ঞানেও ভরা। কিন্তু সবই তাঁর প্রাণবান প্রাণস্পর্শ পেয়ে সজীব, শুভ্র নির্মল স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর প্রাণধর্মই যেন স্বচ্ছন্দ সানন্দ কৌতুক হাস্যের। পরিহাস থাকলেও অবজ্ঞা থাকত না। ঈর্ষা, অসূয়ার লেশ ছিল না, নির্মল পরিহাসে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বা খেলো রঙ্গ-তামাসারও নয়। বুদ্ধির সঙ্গে রুচি মিলিয়ে আনন্দোচ্ছলতার। খোঁচা যা থাকত, তাতেও থাকত না বিষের লেশ, কঠিনতা বা বিদ্রূপ। হাসতে পারতেন তার খোঁচায় তাঁর খোঁচা-খাওয়া বন্ধুও।

সংস্কৃত ভাষায় তাঁর টান ছিল। পণ্ডিতদের সম্মান করতেন। বিদ্যানিধিদের তবু পরিহাস করতে ছাড়তেন না। "আপনাদের—শিরোমণি মশায়দের উপাধি দেয় কে? নবদ্বীপের ঝিদের সিনেট। সেখানে টোলে পড়তে যান পণ্ডিত মশায়রা। ঝিরা কাপড়-চোপড় গুছায়, কাজকর্ম করে দেয় ছাত্রদের। নাম ধরে ডাকে কি করে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের? ঝিরা নিজেরা নাম ঠিক করে নেয়—উনি ন্যায়রত্ন, উনি বিদ্যাবারিধি, উনি স্মৃতিচঞ্চু। লেখাপড়ার শেষে ফিরে যান তাঁরা ন্যায়রত্ন, বিদ্যাবারিধি, স্মৃতিচঞ্চু—ঝিদের দেওয়া উপাধি নিয়ে।"

জাত-ব্যাপারে তাঁর পরিহাসটা একালেও গ্রাহ্য। ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকল হিন্দুই

তো আমরা লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসার পূজা করি। তিনি ক্ষৌরী হতে হতে তাঁর ক্ষৌরকার কৈলাশকে বলতেন, "তোমার মনসা ঠাকুরুণকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও। আমার মনসা ঠাকুরুণ বসে আছেন—নখ কাটতে হবে, আলতা পরাতে হবে। আমার মনসা যে ব্রাহ্মণের মনসা, তোমার মনসা নাপিতের মনসা তো। শীগগির পাঠিয়ে দিয়ো"।

আমাদের স্কুলে এক সময়ে মাস্টার মশায়দের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন জাতিতে যোগী. কেউ কর্মকার, কেউ বারুই, কেউ পাথিয়ল। বাবা ছিলেন স্কুল কমিটিরও একজন। ওকালতির পূর্বে বছর পাঁচ-ছয় তিনিও ইস্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। অন্য স্কুলের একজন কর্তা বললেন, "কি হে তোমরা কি খেস্টানদের মতো কাস্ট রিফর্ম করছ নাকি"? তিনি বললেন, "পাগল! আমরা স্বদেশী টেকনিক্যাল এডুকেশনের আয়োজন করছি"।

একজন ছিলেন অভিজ্ঞ শিক্ষক—ত্রিপুরাকৃষ্ণ গুপ্ত। ছেলেদের বাড়িতে পড়িয়ে পাশ করাতে ত্রিপুরাবাবু ছিলেন ওস্তাদ। দাদাদের ম্যাট্রিকের দুয়ারে পড়িয়েছেন, আমাদের দু-ভাইকেও পড়াতেন। বাবার সময়কার শিক্ষক আমরা পরীক্ষা দিয়ে ফিরছি—গুপ্তমশায় বাবার সঙ্গে বসে আছেন বাড়িতে। সমুচিত আত্মপ্রসাদে বলছেন, "এই শেষ পরীক্ষার বেলা সবাই ধরে আমাকে"। বাবা সহাস্যে বললেন, "ঠিকই করে। বৈতরণী পার হতে আপনাকেই তো ধরতে হবে"।

'পি. ডব্লু. ডি.'র নাম দিয়েছিলেন তিনি 'পাবলিক ওয়েস্ট ডিপার্টমেন্ট'। প্রথম যুগের শিক্ষামন্ত্রীত্বের বিষয়ে বলবেন, "স্কুলে তো নিরক্ষরদের পাঠাতে হয়—শিক্ষাভাব বলেই তো চাই শিক্ষামন্ত্রী"। পুলিশ বিভাগের প্রতি ছিল তাঁর সাধারণ অরুচি। "পুলিশের চাকরের ছেলে মানুষ করা অসম্ভব। থানায় থাকবে কোয়ার্টারে, কাছে ভিতে মানুষ নেই। দেখে শুধু চোর আর ঘুষখোর"। এর ব্যতিক্রম দেখাতেন আবার পাড়াতেই—আনন্দকিশোর রায়কে। কিন্তু তারপর হেসে বলতেন আবার, "ক্ষতি কি ছেলে মানুষ না হলে? মাসে একবার করে শহরে যাবে—পুলিশ সাহেবকে স্যালুট করতে। সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে সম্বর্ধনা জানাবেন 'ডেম, বদমাস' বলে—দু-একটা লাথিও খেতে হতে পারে। কিন্তু স্যালুট করে একবার পথে বেরুলেই তো হলো—দু-ধারে মানুষকে 'শালা', 'বদমাস' বলে লাথি-ঘুষি

চালিয়ে যাবে। মুখের হাতের সুখ সমস্ত মাস ভর্তি গ্যারান্টিড। লাভই তো বেশি।"

ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের চিত্র বোঝাতে অদ্বিতীয় তাঁর মন্তব্য। "ওদের তাসখেলা ত্থাখো (তিনি জীবনেও তাস, পাশা, দাবা খেলেন নি)। রঙের তাস সকলের ওপরে—রঙের দুরি-তিরিও অন্য রঙের সাহেব-বিবিদের থেকে বড়। ওরা হলো রঙের তাস, আমরা বদ-রঙের"—ইংরেজিতে বলতেন সুরেন্দ্রনাথের বহু উদ্ধৃত কথা—"ইভন দি টলেস্ট এমাং আস মাস্ট বেণ্ড"। আবার বোঝাতেন আমলাতন্ত্রী চরিত্র "ওদের খেলা দেখেছ—গ্র্যাবু (?)। রঙের গোলাম সকলের সেরা। রঙের রাজা-রাণীও গোলামের থেকে ছোট। অন্য সাহেব-বিবিদের কি আবার তবে দাম?"

অথচ পলিটিকসে তিনি সক্রিয় হন নি। এক সময়ে কংগ্রেসে যেতেন। বৈঠকখানায় সাজানো ছিল দেশের মনস্বীদের আলেখ্য—রামমোহন প্রভৃতি। তেমনি ছিল প্রথম থেকে প্রায় ১৯০৭ পর্যন্ত কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টদের ছবি। নামগুলো ধারাবাহিক মুখস্ত বলতে পারতাম আমরা। 'হু ইজ হু অব' জাতীয় আন্দোলন আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল মুখে-মুখে। তিনি কি জানতেন—আমাদের রাজনীতিতে দীক্ষা হয়ে গেছল কখন কি ভাবে?

গান্ধী আন্দোলনের তিনি বিরোধী হলেন। আমার বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু স্কুল-পিকেটিং করছে—বছর কয় আগে। তিনি সে স্কুলের সেক্রেটারি। উল্টো পিকেটিং-এ সচেষ্ট। বন্ধু আবার উকিলের ছেলে। পিতা তাকে বললেন, "মনো, ছাত্রদের স্কুল ছাড়াচ্ছিস কেন"?

"ভলাণ্টিয়ার চাই"।

"ক-জন পাবি স্কুলে? তার চেয়ে ওই ত্থাখ পথে কত লোক যাচ্ছে তাদের নিয়ে যা।"

"ওরা বোঝে না।"

"তাহলে তো ওদেরই এনে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দে—শিখুক বুঝুক।"

শেষদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উগ্রতায় তিনি হিন্দুমহাসভার স্থানীয় কর্তা হন। কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য—অনাচরণীয়দের জল-চল করা, বিধবাদের পুনর্বিবাহ। গোঁড়াদের ক্রোধ হলো। পণ্ডিত মশায়দেরও বিরূপতা সইতে হয় এবার। কিন্তু তিনি ধীরভাবে সয়ে গেলেন। "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ—কতকালের সংস্কার ওঁদের"। হিন্দুরা আরও চটে

গেছলেন। মুসলমানদের গরু কোরবানিতে হিন্দু জমিদারদের আপত্তি ছিল। বাবা কিন্তু জমিদারকে বোঝালেন—ওদের বাড়িতে ওদের ধর্ম-আচরণ করবে, তাতে আপত্তি করবেন কেন? অন্যকে আঘাত না দিলেই হলো। এক মুসলিম পীরকে তিনি কিছু জমি বন্দোবস্ত পাইয়ে দেন। পীরসাহেব কেমন জানি না। এক হিন্দু তাঁর শিষ্য হন। মুসলমান হয়ে তিনি নিজ কন্যাকে দেন ওই পীরসাহেবের সঙ্গে সাদি। বাবা বলতেন, "ওসব কী ব্যাপার বুঝি না। এমন কত কাণ্ড তো মুনি-ঋষিরাও করেছেন। তাঁরাও তো ঋষি। ইনিও পীর"।

ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল—আরও বেশি সুনীতিতে, সুরুচিতে। হিন্দু হলে কি হয় ও-বিষয়টায় তিনি ব্রাহ্মদের মতো। বোধহয় গুরুদাস বাঁড়ুজ্জের অনুগামী। আসলে ধর্মভাবটাও ছিল একটু উদার—বোধহয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের থেকে পাওয়া। তবে তাঁর শেষ আশ্রয় গীতোপনিষদ—শুধু উপনিষদ নয়, আবার শুধু গীতাও নয়—ওই 'সায়েন্স অব লাইফ'ও তাঁর শিয়রের পার্শ্বে ছিল।

আজ উনি গেলেন। পৃথিবীতে তাঁর শূন্যস্থান কারও চোখে পড়বার কথা নয়। বাঙলা দেশের সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক এভাবেই তো যায়। সংসারের দশজনকে নিয়েই তাঁদের জীবন। ওঁর বিশেষত্ব কোথায়? কর্তব্য করেছেন, স্বচ্ছন্দ আনন্দে, আমাদের কর্তব্যত্রুটিতে দুঃখিত হয়েছেন। দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু হাসি ফুরোয় নি, কৌতুক শেষ হয় নি। এখনো সেই হাসিই মুখে।

(ক্রমশ)

গোলাপ হয়ে উঠবে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

ফর্সা টকটকে রঙ, বিশাল স্থুল দেহ। রোগের যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত। • একটা পুরনো তক্তাপোষে বালিশ ঠেস দিয়ে বসে বসে মা নিঃশ্বাস নেবার জন্য প্রাণপণে যুঝছে। আগস্টের ভ্যাপসা গরমে ওষুধপত্রের গন্ধে ঘরটায় কেমন যেন দম আটকে আসে। নন্দিনী মাথার কাছে। পাখা নিয়ে হাওয়া করছে। নন্দিনী একটু মোটা হয়েছে। দুপুরবেলা হঠাৎ সুব্রতকে দেখে অবাক হয়ে গেল। পাখা ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। সুব্রত মায়ের কাছে গিয়ে ডাকল—মা। ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে মা কাছে ডাকল। হাত দিয়ে বলল—বস্ এখানে।

—ছেড়ে দিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—আমি জানতাম তুই আজ আসবি।

—কী করে জানলে ?

—আজ ভোরবেলায় একবার চোখ বুজে এসেছে আর স্বপ্ন দেখেছিলাম। থেমে থেমে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মা কথাগুলো বলল। নন্দিনী বলল—আপনি একটু বসুন, আমি আপনার খাবার যোগাড় দেখি। নন্দিনী উঠে দাঁড়াল। আঁচল থেকে চাবিটা মেঝেয় পড়ল ঝন্ করে। নিপুণ ভঙ্গিতে গুটিয়ে নিয়ে নন্দিনী চলে গেল। মা আবার কথা বলতে চাইল। সুব্রত মায়ের মুখের কাছে কানটা নিয়ে গেল।

—রমেন মারা যাবার পর তোমার তখুনি আমাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।

—তুমি রমেনের খবর পেলে কী করে ?

—সবাই জানে। আমি শুনেছিলাম তুমি রমেনের সঙ্গেই ছিলে। তারপর

আর তোমার খবর নেই। বেড়ে গেল অসুখটা…বড় বোকা তোমরা…এত ভাবাও…সুব্রত চুপ করে রইল। কুলুঙ্গিতে পুরনো টাইমপীস্। সেই পুরনো টাইমপীসটাই। কতদিন আগে দম কেটে গেছে। সারানো হয় নি। আজো তেমনি পড়ে আছে। মায়ের গলায় শ্লেষার ঘড় ঘড় শব্দ। নিঃশব্দ দুপুর। গলির মাথায় ফেরিওয়ালার ডাক। নন্দিনীর রান্নাঘর থেকে কী একটা ভাজার আওয়াজ আসছে। এই তার আশৈশবের গৃহকোণ। এ ঘরটায় মায়ের কাছে ছোটবেলায় শুতো—এই তক্তাপোষে। পাশের ঘরটা ছিল বাবার। মায়ের ঘরের দেওয়ালে বাবার বড় ফটোটার দিকে তাকাল সুব্রত। আলিপুর কোর্টে ওকালতি করতেন। ছিপছিপে চেহারার এই প্রৌঢ়ই এই স্থুলাঙ্গিনীর স্বামী ছিলেন। পুরনো দিনের গোঁফ, তীক্ষ্ণ চোখ আর চৌরশ কপাল—লোকটা ভালোই কাটিয়ে গেছে। কোর্ট-মক্কেল—আর বৈঠকখানায় গানের আসর—নামকরা ধ্রুপদী ছিলেন.তিনি। মা একটু ঘুম-ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যেন। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কী সব বলার চেষ্টা করছেন—উনি বলতেন…কী বলতেন উনি ? প্রশান্ত ছবিটির দিকে তাকিয়ে সুব্রত শুনতে পেল—স্ট্রাকচার ইট্সেলফ উইল স্পিক, অস্থায়ি অন্তরা সঞ্চারি আভোগ—তানকে সমানভাবে ভাগ করতে হয়। বিস্তার ছাড়া সমের মানে কি, তোমরা কিছুরই স্ট্রাকচার বোঝ না। গান অত সোজা না, সরস্বতী সুরসৃষ্টি করতেন, গণেশ ধরতেন সঙ্গত—সে তোমাদের বিস্কুট-খাওয়া গলায় আর তেত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়ে হয় না। বিস্তার নেই সমের কেরামতি, পূজো নেই প্রসাদ, আবাহন নেই বিসর্জন—

—সুব্রত। মা আবার ডাকল।

সুব্রত আবার তাড়াতাড়ি মায়ের মুখের কাছে এগিয়ে এল—

—একদিন রমেনের মা এসেছিলেন।

—কী বলেন ?

—বলছি দাঁড়া, একটু একটু থেমে দম নিতে লাগল। তারপর বুকের কাছে বালিশটা আঁকড়ে ধরে মা বলল—রমেন মরেছে তোর জন্যে সুব্রত ?

সুব্রত চমকে উঠল। ওর মনে পড়ল জেলের কথা, শান্তনুর কথা। মাকে জবাব দিল না। মা হেঁট হয়ে বালিশে মাথা রেখে হাঁফাতে লাগল।

—তুমি এ-কথা বিশ্বাস কর মা ?

—না, কিন্তু লোকে বলছে কেন ?

—রটানো হয়েছে ?

—কারা রটায় এসব ? চুপ করে রইল সুব্রত। কী বলবে ? মানবের কথা।

—কী যে সব হচ্ছে কিছু বুঝি না।

স্ট্রাকচার ইট্‌সেলফ উইল স্পিক—স্ট্রাকচার যে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এক হয় রুচিকে একবার মায়ের কাছে নিয়ে এলে। কিন্তু রুচিই যদি বিমুখ হয়ে থাকে এইসব প্রচারে—তাহলে ?

—আচ্ছা আমি তোমায় বুঝিয়ে বলব সব, তুমি একটু সামলে নাও ?

—আমাকে বোঝাতে হবে না, নিজের কাছে ঠিক থেকো। তোমরা আবার সব ভগবান মানো না। কেন যে মানো না, প্রিয়ব্রত তো মানে—

—মানার কোনো কারণ নেই। প্রিয়ব্রতরও নেই।

—ভগবানকেও কাজের নিয়ম ধরেই চলতে হয়, তাঁকেও নিজের কাছেই ঠিক থাকতে হয়।

—আচ্ছা—তুমি একটু চুপ কর এবার।

বুড়ি আবার বালিশে মাথা রাখল। ফর্সা রঙ কষ্টে, যন্ত্রণায় কালো হয়ে যাচ্ছে। বিশাল শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে।—নন্দিনী ছেলেপিলে চায় না, তুমি বিয়ে করলে না, তোমার আগে তোমার ছোটজন বিয়ে করল, তাও মন্ত্র পড়ে নয়, পূর্বপুরুষ জল পেলে না, তোমরা কিছুই মানো না—অথচ নন্দিনী আমার এখানে বসে বসে কাঁদে, বলে আমাকে আশীর্বাদ করুন—কিছু বুঝতে পারছি না—সব যেন কেমন হয়ে গেছে। সেই প্রশান্ত প্রৌঢ়ের ছবিটির পিছনে টিকটিকিদের বাসা। সেদিকে তাকিয়ে রইল সুব্রত। বুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে বিড় বিড় করতে লাগল।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে নন্দিনী রাঙা মুখে ঘরে ঢুকল।—খাবেন চলুন।

নন্দিনীদের ঘরেই নন্দিনী সুব্রতর খাবার জায়গা করেছিল। প্রায় বছর-খানেক বাদে দোতালার ঘরে ঢুকল সুব্রত। সুব্রত খুসি হলো নন্দিনী তাকে রীতিমতো খাতির করেছে দেখে। তুলে রাখা একটা দামী পশমের আসন পেতেছে। জলের গ্লাসে সুন্দর ঢাকনি। বড় একটা বগি থালা, গোটা-দুয়েক বাটি। ডিমের ডালনায় অসময়ের টোম্যাটো। সুব্রত হেসে ফেলল—সাজিয়েছ ভালো। হেসে অন্যদিকে তাকিয়ে নন্দিনী বলল—কী আর সাজাবার আছে ?

—তোমার অফিস ছিল না আজ ?

—দুদিন ছুটি নিয়েছি। মায়ের অসুখ। ছুটি নেবার উপায় নেই বেশি। তবু নিলাম।

—অফিস ছাড়ে না ?

—অফিসও ছাড়ে না, আর আপনার ভাইও পছন্দ করে না।

—ও ফিরবে কখন ?

—অনেক রাত্রে। ভোরে বেরিয়ে যায়। দুপুরের খাওয়া বাড়িতে কোনোদিনই খায় না।

—তুমি ?

—আমি নটা-পনেরোর লালগোলাটা ধরি। রাধার মা আছে ঐসব দেখে। ভাতের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে সুব্রত আঙুল বের করে নিল। গরম চুড়ো-করা ভাত। ভালো লাগল।

—এখন আবার ভাত রাঁধলে ?

—না। দমে বসিয়ে গরম করলাম।

—তোমার ভাতটা দিয়ে দিলে, না ? একটু হেসে ঘাড় নাড়ল নন্দিনী, 'না' বলল। সুব্রত বুঝল। আর এ-নিয়ে কথা বাড়াল না। নন্দিনীদের ঘরটা আসবাবে বোঝাই। নতুন টেবিল। সোফা-সেটি, আলমারি, হোয়াট নট, খাট—কতকগুলো থেকে পালিশের গন্ধ যায় নি। খাটের তলায় কাগজে মোড়া দুটো পাখা। ইস্ত্রি, হিটার।

—ঘরটাকে এমন ভর্তি করে ফেলেছ কেন ?

—আমরা চলে যেতাম। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেওয়া হতো। মায়ের অসুখ বাড়াবাড়ি হওয়ায় যাওয়া পেছিয়ে গেল। সেইজন্যেই পাখা লাগানো হয় নি।

—কোথা যেতে ?

—বেহালায়। একটা ভালো বাড়ি পাওয়া গেছে। ওর কলকাতা গেলেই সুবিধে। সুব্রত নিঃশব্দে টোম্যাটোর শাঁসটা চুষে নিল। ডিমের কুসুম ভাতে মেখে নিল। হাত পাখাটা দু-বার জোরে জোরে দুলিয়ে নন্দিনী বলল—আমার একেবারে ইচ্ছে নেই যেতে।

—কেন ?

—বলব আপনাকে—পরে বলব। মাকে বলি বলি করেও—ওকি উঠবেন না। চাটনিটা জুড়ুতে দিয়েছি, নিয়ে আসি।

অনেকেই হয়তো আজ এমনি সময়ে বহুদিন বাদে বাড়ি পৌঁছল। এমনি কোনো না কোনো স্নেহময়ী আত্মীয়ার কাছে খেতে বসেছে। নন্দিনীর কী একটা সমস্যা জুটেছে—সে জুটুক—পরে সে-কথা ভাব্য যাবে এখন। এখন তার এই আদরযত্নটুকু ভালো লাগল। নন্দিনীকে এত ভালো মেয়ে কখনো মনে হয় নি। এভাবে নন্দিনী কখনো বসিয়ে খাওয়াবার সুযোগও পায় নি। চাটনির প্লেটটা বসিয়ে দিয়ে নন্দিনী আবার বেরিয়ে গেল—আসছি এক্ষুনি। মা ডাকছেন। ফিরে এলো তখনি।—মা বলছেন ডিমের সঙ্গে দুধ খাবেন না। রাধার মাকে পাঠিয়েছি—দৈ নিয়ে আসছে। ভালো লাগল, ভারি ভালো লাগল। তারপরেই ভালো লাগাটা মনের মধ্যে কালো হয়ে উঠতে লাগল—এমনি করে রমেনও ফিরতে পারত, বিনয়, সমীর এরাও। ভাতের মুঠোটা হাতে করে হঠাৎ কষ্ট হতে লাগল। রমেনের মা বৌদি এমনি করেই কিম্বা রুচি এই ভাবেই ঘিরে ফেলত তাকে। ভাতের থালার দিকে মুখ নামিয়ে চুপ করে বসেছিল সুব্রত। মুখ তুলতেই দেখল নন্দিনী ওর ভাবান্তরটাকেই দেখছে।—খেয়ে নিন, বসে আছেন যে—নন্দিনীর প্রশান্ত অনুনয় যেই স্নিগ্ধ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর মনে পড়ে গেল এমনি করে নিত্যদার সামনে আজ কেউ বসে নেই। অনেক গেল। হয়তো এমনিই যায়, এমনিই—

এক বিমর্ষ শূন্যতা চারিদিকে—নন্দিনীও যেন তাতেই মিলিয়ে গেল। নির্জন দুপুরে এই ঘরে বসে বসে তার মনে হলো সে এক অনাত্মীয় পরিবেশে বসে রয়েছে। আপ্যায়ন, আহার্য এসব তার পাওনা নয়—কোনোটাই নয়। যাদের প্রতীক্ষাও ভেঙে গেছে আজ তাদের কথাই বেশি করে মনে পড়ল। রুচি—রুচির সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। রুচিকে রমেনের গল্প যতটা সে জানে সব বলবে। যে সন্দেহ সবাই করছে তা যেন রুচি না করে। না—রুচি তা করবে না নিশ্চয়। একসঙ্গে বসে বসে দীর্ঘ সময় রুচি আর সে রমেনের গল্প করবে। রুচির যদি ইচ্ছে হয় রমেনের মায়ের সঙ্গে একবার ওরা দুজনেই দেখা করবে। তারপর—তারপর কী করবে—সব যন্ত্রণার শেষে নিজেদের ফিরে পাবে?

—নন্দিনী আমার ঘরের চাবিটা দাও এবার।

—এ ঘরেই বিশ্রাম করুন না। আমি তো মায়ের ঘরে থাকব।

—না, নিজের ঘরেই চলে যাই।

নিজের ঘরের পলাস্তারা-খসা দেওয়ালের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে সুব্রত

ভাবল এই শূন্যতাকেই আগে তাড়ানো দরকার। কেন বিচ্ছিন্ন হব। কেন হারিয়ে যাব। দমদম জেলের দিনগুলো মুছে যাবে—মুছে যাবে তুঁত গাছতলায় প্রদীপ জ্বালানোর স্মৃতি—রমেনের রক্তের দাগ—সেও তো মুছে যাবে।—সুব্রত নিজেও তো যাবে, যাবেই—তবে তার আগেই সে এত ফুরিয়ে যাওয়ার কথা মিছিমিছি ভাবছে কেন। পুরনো দেওয়াল আলমারিটা বাবার আমলের। সুব্রতর বইপত্র থাকে। আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। মায়ের কাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। নন্দিনীর অনুযোগ। সে কি এই জন্যে ফিরে এলো। মাকে খুসি করতে আর নন্দিনীর কাছে খুসি হতে—কী মানে এ সবের—ওর ঘরের জানলা দিয়ে দূরে কাদের বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক, ক্যামেরা স্ট্যাণ্ড, কালো পর্দা—বোধহয় কোনো পারিবারিক গ্রুপ ফটো তোলা হচ্ছে—এ বাড়িতে যদি হয় সে কি দাঁড়াতে পারবে। কেউ পিছু টানবে না—কিছু না?

কিম্বা, হয়তো এর কোনো কথাই সত্য নয়, হয়তো সবই সয়ে যাবে। সয়ে যাওয়া মানেই তো ভুলে যাওয়া। আলমারিটা একটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল। একখানা বই বার করল—আর বইখানা থেকে খানিকটা মাটি ঝুর ঝুর করে খসে পড়ল। উই। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। সুব্রতর গণনার শক্তির বাইরে। কাঠের তাক, কাগজ, বই সব একরাশ ধুলো হয়ে ফোঁপড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত কথা, কত তর্ক, কত মীমাংসা—সব সময়ের পোকায় কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। একমনে মানুষ যেমন করে আয়নায় ছবি দেখে—সুব্রতও তেমনি করে ভেতরটা ফাঁকা ওপরটা আস্তো বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। যে বইটা হাতে ধরেছিল তার ওপরের পাতায় স্তালিনের ছবি ছিল একটা। উই তাড়িয়ে মাটি মুছে সুব্রত ছবিটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক এইসময় নন্দিনী ঘরে ঢুকল।—জানেন আপনি এসেছেন তো, মা আজ অনেকটা ভালো। ওমা একি ইস্—সুব্রত বোকার মতো হেসে বলল—সব মাটি হয়ে গেছে।

পরের দিন, কি তার পরের দিন সন্ধ্যার দিকে নৈহাটী গেল সুব্রত। বাসে দু আনা লাগে। খুব বেশি দূর নয়। বাসে যেতে যেতে একটা মুসলমান এলাকা পার হতে হয়। বস্তিটা প্রায় ফাঁকা। দেওয়ালে আগুনের

দাগ। চালে খাপড়া নেই। মোড়ের মাথায় পুলিশ চৌকি। যেতে যেতেই সুব্রত দেখল ওদের ছোটবেলার চেনা কবরখানার সামনে বিরাট পোড়ো জমিটায় সারি সারি হোগলার চালা উঠেছে। দু-খানা বাঁশের খুঁটিতে একখণ্ড বড় টিনে রঙ দিয়ে লেখা ক্ষুদিরাম-কলোনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে। যেতে যেতেই একপশলা বৃষ্টি নামল।

ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষ, সূর্যসেন এক-একটা হতশ্রী পোড়ো জমিতে এখন নাম রূপ নিয়েছেন। যাদের সব গেছে—তারা আবার নতুন করে শুরু করবে বলেই বোধহয় এই নামগুলোকেই সংগ্রহ করেছে যেগুলো অনেক কিছুর উপক্রমণিকা। শেয়াল মেরে, নেকড়ে তাড়িয়ে, সাপের কামড় খেয়ে, কলেরায় মরে আবার নতুন করে বানাতে হবে যাদের তারা বোধহয় এই নামগুলোকেই বেশি আঁকড়াবে। সুব্রতর মনে হলো নামগুলো সবই যন্ত্রণার প্রতীক। তাই এদের চূড়ান্ত যন্ত্রণার পটে হয়তো সহজে এ নামগুলোই লেখা হয়। সেখান থেকে বাসে উঠলেন ঘোমটা-টানা একটি প্রৌঢ়া। সুব্রতর দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটা কার্ডবোর্ডে আঁটা কাগজ। সুব্রত পড়তে লাগল—পত্রবাহিকা বিন্দুবাসিনী দেবী ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার শ্রীপুর গ্রামের সেন চৌধুরী পরিবারের বধূ। গত কার্তিক মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইনি···জানা কথা, সবই জানা কথা। ও নেমে পড়ল। ভদ্রমহিলার কাগজখানা শেষ অবধি পড়ল না। কী হবে পড়ে। কী করতে পারে সে।

যে পাড়ায় প্রকাশবাবু বাসা করেছেন সেটাই নৈহাটির সবচেয়ে বনেদি পাড়া। রাস্তায় একফোঁটা আবর্জনা নেই। পিচ-চকচক জল ধোয়া পথে তখন ইলেকট্রিক আলো চিক চিক করছে। বাড়িগুলো সাজানো ছবির মতো। এত শান্ত পাড়াটা যে মনে হয় সারা দিনে হয়তো বড়জোর গোটা কতক সাইকেল রিক্সার নিঃসঙ্গ প্যাক প্যাক ছাড়া আর কিছু বাজে না। মাইক নেই। মোড়ের মাথায় ছেলেদের হুল্লোড় নেই। এক একটা ছবি-ছবি বাড়ির, এক একটা কবি-কবি নাম। 'প্রশান্তি', 'দিগন্ত', 'সন্ধ্যামণি', 'দি ড্রিম'। সকলেরই বাড়ির একলা-থামের গোল বারান্দার সামনে একটু করে বাগান। রাস্তার গেট সযত্নে বন্ধ। বাগানে হয়তো অনেক ফুল—কিন্তু বাইরে হয়তো বিজ্ঞপ্তি 'বিওয়ার অফ ডগস্'। আর বাগানে কেউ নেই। নির্জনতাই যেন বাগানে জমাট, যেন বাড়িগুলোর সমস্ত আবেগ অনুভূতিকে ঢাকা দিয়ে আড়াল

করে রেখেছে সেই সব গাছেরা। হাঁটতে হাঁটতে প্রকাশবাবুর বাড়ি খোঁজ করতে লাগল সে।

যে বাড়িটা প্রকাশবাবুদের, তার ফটকে সাঁচি তোরণের বাহার। তোরণের মাথায় বুগোনভেলিয়ার লতা সতেজ এবং শতমুখী। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে বসবার ঘরে বেতের চেয়ারে বসে প্রকাশবাবু একটা বড় বাঁধানো খাতা দেখছেন। বারান্দায় সুব্রতর জুতোর শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উনি চশমা নিয়েছেন। কালো মোটা ফ্রেমের চশমায় একটা ব্যক্তিত্ব এসেছে যেন। হাসি মুখে সুব্রত বলল—ভুলে গেছেন।

—আরে এস এস। আশাই করি নি, আরে শুনছ দেখে যাও কে এসেছে। মাঝের দরজার পরদা সরিয়ে রুচির মা ঘরে ঢুকলেন।—সুব্রত। কী অবাক কাণ্ড। কবে এলে। মা কেমন আছেন? মায়ের যে অসুখ শুনছিলাম। স্মিত মুখে সুব্রত নানা কথার জবাব দিতে লাগল।

—কতদিন বাদে, উঃ, কত যে ভেবেছি তোমার কথা আমরা। কর্তা বললেন। গিন্নি বললেন—

—তা হলো বইকি এ বাড়িতে এলাম আমরা ফেব্রুয়ারী মাসে আর তুমি গেছ নভেম্বরে, তাই না গো? আর এটা আগস্ট—

—তাই তো। ফেব্রুয়ারির দশ তারিখেই তো কমিটির মিটিং হলো।

—আমি আপনাদের সব খবরই পেয়েছিলাম।

—কার কাছে?

—শান্তনু?

—নন্দদার ছেলে। ওমা সে মুখপোড়াও গেছে নাকি জেলে, কী কাণ্ড।

—কী কী শুনলে?

—আপনি হেড মাস্টার হয়েছেন, এ বাড়িতে চলে এসেছেন—

—না এসে করি কী বল। সকাল দুপুর দুটো সিফট ঘাড়ে পড়েছে। আমাদের ওদিকটা তো জানো যাতায়াতের বড় কষ্ট। কাজেই বাস রাস্তার কাছে বাসা দরকার। আর বাড়িখানাও দেখেছ তো, কী আছে আর ওর বল? বাসোপযোগী বলা চলে?—তুমিই বলো না!

—বেচে দিচ্ছেন শুনলাম বাড়িটা,

—একেবার সেটল করি নি, তবে ওটা রিপেয়ার করাতে যা লাগবে সে টাকা এখন নেই। যা দিনকাল ফেলে রাখি কোন সাহসে? বল—কে

কখন ঢুকে পড়বে—উদ্বাস্তু—সাতখুন মাপ—তারপর রেণ্ট-কণ্ট্রোল অফিসে ভাড়া জমা দেবে—এখন হাটো তুমি দু-বেলা। তবে এখনো ঠিক করি নি। তারপর তোমার কি খবর—

—এই তো। দিন তিনেক হলো বেরিয়েছি। কানের কাছে মুখ এনে প্রকাশবাবু নিচু গলায় বললেন—

—সুব্রত, তোমাকেও ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি—একদিন মানব এসেছিল, বলল।

—মানব আর কী বলল ?

—আরে সে এক কাণ্ড, জানো মানবকে শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতেই হলো যে আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারব না। মানবের অডাসিটি ভাবো আমাকে বলে কিনা ভবেশবাবুর সঙ্গে আমার এত হবনবিং কিসের—আরে ভবেশবাবু কংগ্রেসের এম. এল. এ. হতে পারে, কিন্তু আমার স্কুল কমিটির সেক্রেটারি লোকটা। ওপরে দহরম মহরম কতো। স্কুল যখন ঘাড়ে পড়েইছে তখন আমাকে তো দেখতে হবে কিসে স্কুলটা দাঁড়ায়। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা রোজই বাড়ছে। রিফ্যুজি ছেলেমেয়ের রাশ কী সে আর কী বলব, এখন টাকা নিতে জানলে গবর্নমেণ্ট দেবে টাকা. আর মানব কী এক ছাত্র ধর্মঘটে গো ব্যাক সেক্রেটারি স্লোগান দিইয়ে দিলে। একস্ট্রিম্‌লি ব্যাড, আমি মানবকে বলে দিয়েছি ডোন্‌ট কাম। আমাকে সুবিধে হলো না তখন কলেজ থেকে রুচি বাড়ি ফিরছিল তাকে—

—রুচি বাড়ি নেই।

—সিনেমায় গেছে। হ্যামলেট বইটা এসেছে, ওদের বুঝি ওটা টেক্সট—ক্লাসের সব মেয়েরাই গেছে। ফিরবে এক্ষুনি। ওগো সুব্রতকে চা খাওয়াবে না ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সে কি কথা, রুচি আসুক, এই এসে পড়বে। রাত্রে খেয়ে যাও। শেষ যেদিন আমাদের বাড়ি থেকে গেলে—

—হ্যাঁ সে এক—এ বাসাটা কেমন দেখছ ? কথা পাল্টালেন প্রকাশবাবু।

—চমৎকার।

—ঘরদোর সাজিয়েছে রুচি, ওর টেস্ট আছে। স্নিগ্ধ স্বরে প্রকাশবাবু বললেন।

—ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, বাবা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড হলে আর মেয়ের সেখানে চাকরি না করাই ভালো। তাছাড়া ওর বয়স কী বল, পড়াতে পারছিলাম না তাই, নইলে ওর তো পড়ারই সময়। ফেব্রুয়ারিতেই ছাড়িয়ে নিয়েছি—এই সেসন থেকে যাচ্ছে কলেজ।

সুব্রত কী করতে এসেছে, কী বলতে ?—ভয় নেই। সুব্রতকে সুব্রতই সাহস দিল—রুচি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এরা কী জানে—যন্ত্রণা তো এঁদের কেউ নয়, সে তো রুচির। সেই পুলোভারটার প্রতিটি বুনুনিতে সেই যন্ত্রণাই গাঁথা হয়ে আছে। কী অপরূপ বিশাল চোখ দুটো মেলে সে বলেছিল, আগে বলেন নি কেন ? এই তো জানলাম সব। অন্ধকার ফটকটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুব্রত মুহূর্ত গুণতে লাগল। রুচি আসবে—সমস্ত নির্মমতা, বিস্মৃতি জলে যাবে। রমেনের কোনো শোকসভা হয় নি—সম্ভব ছিল না। আজই হবে সেটা। জনসভা না হোক। তাকে যারা সত্যি চেনে, সত্যি যারা তার কথা কিছুতেই জুড়িয়ে যেতে দেবে না সে তো সুব্রত আর রুচি। এই দুটো জায়গাতেই তার মৃত্যু নেই। অনেক কথা বলবে সে—রুচি বললে শুনবে। যে কলঙ্ক তাকে দেওয়া হয়েছে তার কথাও রুচিকে জানাবে। এইটাই হবে তাদের সেতু। রুচি পড়ুক। সুব্রত তার জীবন নিয়ে থাকুক। এই সেতুতে এসে মাঝে মাঝে দাঁড়াবে ওরা। ওর বাবা মায়ের কথা বাবা মা বলুন—রুচি নিশ্চয় রুচির কথা বলবে। এইখানেই হয়তো যন্ত্রণার শেষ খুঁজে পাবে সে। ভিজে-ভিজে গাছের পাতা একবার শিরশির করল। মেঘ সরে গেছে। আকাশপটে দু-একটি তারা। ফটকে একটা আওয়াজ হলো। আর এক ঝাঁক কলহাস্যময়ী তরুণী ভেতরে ঢুকল। রুচির মা বললেন—ঐ সব এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল রুচি আর তার বন্ধুরা।

—মাসিমা দেখুন, রুচি টেনে নিয়ে এলো।

—মা ভাবছিলে, দেখ ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। ওমা, আপনি। কবে এলেন ? জানো মা কী ভীড় যে হয়েছিল কী বলব। লরেন্স অলিভিয়ার সুন্দর অভিনয় করলেন—

—কে কে গিয়েছিলি তোরা ?

—সব, সব, ছায়া, করুণা, মণিকা, দীপ্তি, সুলেখা, মীরা ভট্ট, মীরা দস্তিদার।

—আর গৌরীর কথা বললি নে? রুচির একজন ঠোঁটে-রঙ বন্ধু ধরিয়ে দিল।

—কী হয়েছে গৌরীর? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—গৌরীর তো বিয়ে হয়ে গেছে, দ্বিরাগমনে এসেছে, বরকে নিয়েও এসেছিল।

—সবাই গৌরীর বর দেখার জন্য এমন হুড়োহুড়ি করতে লাগল যে বই আরম্ভ হয়ে গেছে খেয়ালই নেই। রুচির আর একজন সঙ্গিনী বলল। রুচি বলল—

—না বাপু তোরা বড় গোলমাল করিস, সলিলোকিগুলো শোনাই গেল না ভালো—

—আমরা একা কথা বলেছি বুঝি? সবাই হেসে গড়িয়ে গেল।

—জানো মা, কাজলদার সঙ্গে দেখা হলো।

—আসতে বললি?

—বা রে আমি কেন বলব! নির্দোষের মতো মুখ তৈরি করল রুচি। আর দরকার ছিল না, তবু স্বব্রত বসেই রইল। তারপরে চা হলো। সবাই চা খেল। আরো গল্প হলো। আরো হাসি। রুচি তার বন্ধুদের সঙ্গে স্বব্রতর পরিচয় করিয়ে দিল।—আমাদের বাড়ির সঙ্গে এঁর অনেক দিনের সম্পর্ক। ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলে। এতদিন এখানে ছিলেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করল না এতদিন কোথায় ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলে রুচি কী বলত কে জানে। আর বসে থাকার দরকার আছে স্বব্রত চৌধুরী? কমরেড রমেনের রক্তের দাগ অনেকদিন হলো মুছে গেছে, এবার ওঠো, আর কেন—কমিনফর্ম জানিয়েছে পার্টির পদ্ধতি ভুল। ভুল—সবই ভুল। রমেন ভুল, নিত্যদা ভুল। আর ভুলকে ভুলে যাওয়াই তো ভালো। এক এক করে রুচির বন্ধুরা চলে গেল। রুচির মা রান্নাঘরে গেলেন। স্বব্রতও উঠল।—আজ উঠি। রুচি বাইরের বারান্দার আলো জ্বালালো। গেট অবধি এগিয়ে এল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল স্বব্রত—

—আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম রুচি।

—আবার আসবেন।

—কী করে আসব সেটা বুঝতে পারছি না।

—কেন? সোজা চলে আসবেন। আপনার কী?

—(রুচি তোমার একটা স্বপ্ন ছিল না একদিন, কাউকে ঘিরে, কিছুকে ঘিরে?) আসতে বলছ?

—হ্যাঁ, বাবা তো শুধু মানবদাকেই আসতে বারণ করেছেন।

—তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না রুচি?

—না, কী আর জিজ্ঞাসা করব—আসবেন মাঝে মাঝে।

কেন বৃথা কথা বল রুচি—আসবেন—আসবেন—আমি তো আসতেই চাই, তুমি দিলে তবে তো—একথা ভাবতে ভাবতে রাস্তায় নেমে স্বব্রত গঙ্গার ধারের দিকে হাঁটতে লাগল। পিচের রাস্তার জল শুকিয়ে এসেছে। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া কপালে হাত বুলিয়ে দিল। ওপারে চুঁচুড়া। আলো জলছে পথে। বাড়িতে। এপার থেকে যেন মনে হয় মায়াপুরী। এখানে শান-বাঁধানো গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য ছেলেমেয়ে। গল্প করছে। হাসছে। গান করছে। বাঁদিকে দূরে কাছে সারি সারি মিল। সারি সারি বিদ্যুতের আলো পড়েছে গঙ্গার স্থির জলে। ভাঁটা—ভাঁটা এসেছে। ডান দিকে কিছু দূরে ফেরিঘাট—ষ্টীমলঞ্চ এপার-ওপার করছে। আরো দূরে জুবিলি ব্রিজ—মালগাড়ি পার হচ্ছে গুম গুম শব্দে। ঘাটের শেষ পৈঠায় নেমে গেল স্বব্রত। সকলের দিকে পিছু ফিরে দাঁড়াতে চায় সে। সব কিছু থেকে পিছু ফিরে। দূরে গঙ্গার বাঁকের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। এরা জোড়ায়-জোড়ায়, গুচ্ছে-গুচ্ছে হাসছে, ভালোবাসছে, ভালোবাসার ভাণ করছে—হাসাচ্ছে। স্বব্রত শুনতে পেল তারা গান করছে—প্রেমের গান। কিন্তু সত্যিই সে কিছু শুনছিল না। স্থির জলের দিকে তাকিয়ে অন্য কথা ভাবছিল। মানুষের কোনো দর্পণ নেই। মানুষ নিজেকে কখনো দেখতে পায় না। সে যে কত পঙ্গু, কত অক্ষম—কত নির্বোধ—এই স্থির জল আয়নার মতো পড়ে আছে, আকাশ এতে ছবি দেখে নিজের। মানুষ কখনোই ঠিকভাবে তার কোনো চেহারা দেখতে পায় না, তার ক্লান্তির চেহারা, বেদনার চেহারা, নির্লজ্জতার চেহারা কিছুই না। দর্পণ থাকলে রুচি তার পরাভবের আকার দেখতে পেত না? সে নিজে দেখতে পেত না রুচির কাছে সে কী চাইতে যাচ্ছিল তার চেহারা—হঠাৎ স্থির আয়নাটা যেন ভেঙে গেল। কে যেন ক্রোধে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা। গুম গুম করছে চারিদিক। কাঁপছে যেন সব। মাটি যেন সরে যাচ্ছে। স্থির জল দুমড়ে মুচড়ে ঢেউ হয়ে আছড়াতে লাগল ঘাটের কোলে—দুলে উঠল গাছেরা। ইলেকট্রিক তার—। আর শাঁখ বেজে উঠল চারিদিকে—

ভূমিকম্প হচ্ছে। হোক, হোক। ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা, কাপুরুষ সব কিছু। ও ডাঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল কলরব করতে করতে সকলে স্নানঘাটের ছাদের নিচ থেকে ফাঁকা জায়গায় ছুটে গেল। নিভে গেল হাসি গান। সুব্রতই ঘাটের রাণায় দাঁড়িয়ে রইল। একা। পরিত্যক্ত। জল দুমড়ে মুচড়ে আছড়াতে লাগল—ফুঁসতে লাগল—বৃথাই—বৃথাই—খানিকক্ষণ বাদে আবার সবই জুড়িয়ে যাবে। যেমন সব কিছুই জুড়োয়। র‍্যাথ্ অফ জেহোভা ফিলিস্টাইন্‌দের আর কিছু করে না। কিছু না।

নন্দিনীর সেবা যত্নের কাছেই মাঝে মাঝে ছায়া পেতে লাগল সুব্রত। মা একটু ভালো আছে। মায়ের কাছে ভালো লাগলে বসে। নন্দিনী অফিস থেকে ফিরলে একটু গল্প করে। রাত্রে নন্দিনী একটা কিছু নতুন খাবার পরিবেশন করে। কোনো কোনো দিন প্রিয়ব্রত ফিরলে ওরা তিনজনে খেতে বসে। প্রিয়ব্রত এমনিতে বেশ কথা বলে, কিন্তু নন্দিনী সুব্রতর কথাকে বেশি মূল্য দিলে, বা দাদা কী বলেন—ভাব দেখালে প্রিয়ব্রত একটু কর্তৃত্বের মেজাজ নিয়ে আসে। সুব্রত এদের সাংসারিক ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম কথা বলে। নন্দিনী মাঝে মাঝে ওর মায়ের গল্প শোনায়। নন্দিনীর শোনানোর ঢঙে বোঝা যায় যে সে-কাহিনী নন্দিনীর খুব প্রিয়। নন্দিনীর মায়ের নাম ছিল শ্রী। দাদামশাই সে-যুগের স্বদেশীওয়ালা ছিলেন। মেয়ের নাম রেখেছিলেন বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে। বাড়িতে চাকরটাকে পর্যন্ত খদ্দর পরতে হতো। দাদামশাইয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর চিঠিপত্র লেখালেখি চলত। গান্ধিজী যখন চট্টগ্রামে যান তখন ওর মামারবাড়ির সকলে আলাদা করে দেখা করেছিল। নন্দিনী বলতেন—কী বলব মায়ের কথা, মায়ের যখন আঠারো বছর বয়স, দাদামশাই তখন আত্মীয়স্বজনদের কথায় মায়ের জন্য সম্বন্ধ দেখতে লাগলেন। মা দেখতে ছিল ভারি সুন্দর। আমরা সব বাবার চেহারা পেয়েছি—মায়ের কিচ্ছু পাই নি। বড় বড় সম্বন্ধ এলো। কেউ ডেপুটি, কেউ ডাক্তার। মায়ের এক কথা, কাকে বিয়ে করব, বাংলা দেশে ভালো ছেলে যারা তারা তো সব জেলখানায়, বাইরে যেগুলো তারা কি আর মানুষ! সেটা উনিশশো আটাশ সাল। গাঁয়ের বোধহয় আদ্ধেক ছেলের নাম পুলিশের খাতায়। জানেন, মা সেইসব সম্বন্ধ একের পর এক ফিরিয়ে দিল। শেষে মায়ের বিয়ে হলো যখন বাবার সঙ্গে, বাবা তখন ওখানেই স্কুল মাস্টার। আর বিয়ের ছ-মাস যেতে না

যেতে বাবাকে এ্যারেস্ট করল। জেলেই বাবার যক্ষ্মা হলো, মারাও গেলেন। আমি দেখি নি বাবাকে।

সুব্রতকে এই একই গল্প ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নন্দিনী কতবার শোনায়। কিন্তু সুব্রত লক্ষ্য করে যে প্রিয়ব্রত থাকলে এ-গল্প নন্দিনী করে না। সুব্রত এতে একটা মূল্য পায় যেন। প্রিয়ব্রত প্রায়ই কলকাতায় চলে যাবার কথা বলে। মা আর একটু ভালো হলে সে কথাটা মায়ের কাছে পাড়বে একথাও জানায়। নন্দিনী চুপ করে থাকে। সুব্রত জিজ্ঞাসা করে মায়ের সম্বন্ধে কী ঠিক করছিস। প্রিয়ব্রত বলে সেটা মা নিজেই ঠিক করবেন। গেলে আমাদের সঙ্গে যাবেন, না গেলে তোমার সঙ্গে এখানে থাকবেন।

নন্দিনী সেদিন সুব্রতকে বলে—মাকে যেন এসব কথা এখন কিছু বলবেন না। সুব্রত বলে, আচ্ছা। নন্দিনী বলে—কলকাতা যেতে আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই। যদি শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়, তাহলেও মাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই। এটা নন্দিনী ঠিক কথা বলল না। কিন্তু তাহলেও সুব্রত কিছু মন্তব্য করল না। নন্দিনী নিজেই বলল—ওখানে মা টিঁকতে পারবেন না। রাত্রে খেতে বসে প্রিয়ব্রত নন্দিনীকে বলে—আমি বাসার টাকাটা কাল এ্যাডভান্স করতে চাই। নন্দিনী মৃদুস্বরে বলে, এখন না। সুব্রত দেখে প্রিয়ব্রত নন্দিনীকে কর্কশভাবে ধমকে ওঠে—হ্যাঁ কালই। নন্দিনী পূর্ববৎ মৃদু-ভাবে বলে—না এখন নয়। প্রিয়ব্রত বলে—সামনের মাসে আমি শিফ্‌ট করব। যাই। নন্দিনী বিনুনী সমেত ঘাড় নেড়ে বলে—না।

—আই মাস্ট।

—ইউ ওন্ট। নন্দিনী প্রিয়ব্রতকে ঝোল থেকে মাছ তুলে দিল। এবং প্রিয়ব্রত গরম ঝোলের থেকেও আগুন হয়ে ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগল। নন্দিনীও যে রেগে গেছে সেটা বোঝা গেল নন্দিনীর শুকনো গলার আওয়াজে —আপনাকে আর দুটো ভাত দিই?

—যাবে না কেন? প্রিয়ব্রত মাথা ঠাণ্ডা করে জিজ্ঞাসা করল।

—এটা সে আলোচনার জায়গা নয়।

—বিয়ের আগে তুমিই তো কণ্ডিশন দিয়েছিলে যে কলকাতায় শিফ্‌ট করতে হবে—

—হ্যাঁ, দিয়েছিলাম, এখন সে-কথা বলছি না। এখন যেতে পারি না, কেন না—নন্দিনী পিছু ফিরে একটা থালায় নিজের

ভাত বাড়তে লাগল। সুব্রত ভাবল নন্দিনী বোধহয় মায়ের অসুখের কথা বলবে।

নন্দিনী বলল—আমি চাকরি ছেড়ে দিতেও পারি।

—আর ইউ ক্রেজি?

—ইয়েস, যদি বাড়াবাড়ি কর ছেড়েই দোব।

—তার মানে জানো তুমি?

—তার দরকার নেই। প্রিয়ব্রত ভাতের থালা ঠেলে দিয়েই উঠে যেত বোধহয় সুব্রত রয়েছে বলে সেটা আর করল না। নন্দিনী সেখানেই একপাশে এদের এঁটো থালার পাশেই খেতে বসল। এবং খুব প্রশান্ত চিত্তে কচুর শাকে মেশানো ইলিশ মাছের কাঁটার শাঁস চুষতে লাগল। ওদের কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যেই হোক অথবা মায়ের কাসিরও আওয়াজটা হঠাৎ বেড়ে ওঠার জন্যেই হোক সুব্রত ওখান থেকে উঠে গেল। না আঁচিয়ে মাকে দেখার জন্য এগুলো। মৃদু আলো জলছে মায়ের ঘরে। মা হাঁফাচ্ছে। সুব্রত তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—ওরা ঝগড়া করছে?

—না, এমনিই কথা বলছে।

—কী যে সব হয়েছে জানি না, নিজেরাই তো দেখেশুনে বিয়ে করলি সুব্রত মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে সব। মা বলল —আর কিছু ঠিক হবে না। আঁচানো হয় নি। সুব্রত কলঘরের দিকে গেল। খাবার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল নন্দিনী কাঁদছে, হাঁটুতে মাথা রেখে। মাথাটা ওদিকে ফিরিয়ে রেখেছে। পিঠটা থর থর করে কাঁপছে। প্রিয়ব্রত ওপরে চলে গেছে। সুব্রত কিছু বুঝতে পারে না। সমস্তটাই তার কাছে মনে হয় প্রিয়ব্রতর জেদ আর নন্দিনীর গোঁ।

এর মধ্যে একদিন শান্তনু এসে হাজির হলো। শান্তনুকে দেখে যেন মনে হয় কোনো একটা গুরুতর অসুখ থেকে সবে উঠেছে। খুব রোগা হয়ে গেছে। চোয়ালের হাড় দুটো দৃষ্টিকটু হয়েছে। চোখ দুটো বসে গেছে।

—সুব্রতদা।

—কী ব্যাপার, এ কি চেহারা তোমার?

—ভয়ানক ফুরিয়ে যাওয়া মনে হয় নিজেকে। আপনার একবার রুচির কাছে যাওয়া দরকার।

—একবার গিয়েছিলাম। আর যাবার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না।

—সে হিসেবে বলছি না। রুচির কোনো দরকার নেই। রুচিকে নিয়ে একবার রমেনের মায়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার। রমেনের মা খুব ভেঙে পড়েছেন। বাবা বিছানায় শয্যাশায়ী। আর ওঁর মাথাটা যেন কেমন-কেমন হয়ে গেছে। রুচিকে একবার দেখতে চাচ্ছেন। সাধারণ ভাবপ্রবণতা, কোনো মানে হয় না।

—কিন্তু, রুচিকে নিয়ে যাওয়া যাবে কী করে। আমি যা দেখলাম ওরা কেউই আর সে-সব কথা তুলতেই রাজি নয়।

—হ্যাঁ, আমিও গিয়েছিলাম এর মধ্যে, তাই মনে হলো। ওদের স্কুলে একটা ভ্যাকান্সি আছে, তার জন্যেই যাওয়া। সেটা বোধহয় হবে। উনি তো বললেন—দেখবেন। কিন্তু সে যা হয় হবে এখন, আপনি একবার চলুন রুচির কাছে।

সুব্রত কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই শান্তনুর কথায় রাজি হলো। এবং সেদিনই সন্ধ্যার দিকে ওরা দুজনে রুচিদের বাসায় গেল। তখনো ঠিক সন্ধ্যা নয়, গঙ্গার পশ্চিমদিকে আকাশে নানা রঙের রেশ তখনো মিলিয়ে যায় নি। ভ্যাপসা গরম যেটা এ সময়ে থাকে, সে গরম সেদিন ছিল না। বাতাস নরম, একটা বাঞ্ছিত প্রশান্তি মেঘে, গাছপালায়, হয়তো নদীতেও। রুচি সবে বোধ হয় গা ধুয়েছে। চুল বেঁধেছে। কপালে টিপ পরেছে। হালকা নীল রঙের শাড়ি তার, সাদা অর্গ্যাণ্ডির ব্লাউজ—ভেতরের জামার ষ্ট্র্যাপটা দেখা যায় কি যায় না। সাদাসিধে করে শাড়ি পরা। আজই সুব্রত আবিষ্কার করল রুচি একটু মোটা হয়েছে। রুচি একটু বিস্মিত হলো ওদের দেখে তবে ওর মেয়েলি সৌজন্যে কোনো ঘাটতি নেই। শান্তনু বলল—রুচি সুব্রতদা তোমায় কী বলবেন। অন্তরে অন্তরে রুচি যেন সেটাকেই ভয় করছিল।

—এখানেই? একটু যেন বিপন্ন হলো সে।

—তোমার যদি অসুবিধে না হয় এখানেই। দু-সেকেণ্ডে ঠোঁট কামড়ে রুচি কী যেন ভাবল। তারপরে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল—গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসি চলুন। তারপর নিজের শাড়ির দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে রুচি বলল—

এ ভাবেই যাই, এঁ্যা? দাঁড়ান চটি পরে আসি। চটি পায়ে গলিয়ে, চেঁচিয়ে মাকে বলে রুচি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

সেদিনের ঘাটেই সুব্রত গিয়ে বসল। শেষ পৈঠার কাছে। জল যেখানে মৃদু স্বরে কিছু কিছু শান্ত কথা বলে চলেছে, মাঝিদের দাঁড়ের শব্দ যেখানে স্পষ্ট শোনা যায়—স্টীমার গেলে জল যেখানে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দেয়, রাস্তার লাইটপোস্টের আলো যেখানে ঠিক পৌঁছয় না, সেখানে ওরা গিয়ে বসল। অকস্মাৎ নয়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই সুব্রতর মনে হলো কী হবে কিছু বলে, তার চেয়ে অনেক ভাল হবে চুপ করে বসে থাকা। রুচি কী সাবান মেখেছে কে জানে সে গন্ধটা একবার যেন ছুঁয়ে গেল। বিরাট পাল তুলে মালবোঝাই একটা দশ-দাঁড়ি নৌকো দক্ষিণের দিকে যাচ্ছে। জলের চেয়েও নিচু স্বরে রুচি বলল—কী বলবেন? বিনা ভূমিকায় শান্তনু বলল রুচির দিকে না চেয়ে—

—একবার রমেনের মায়ের কাছে যাবে রুচি?

—কেন? রুচি যেন একমুঠো শুকনো বালি ছুঁড়ে দিল।

—রমেনের বাবার অবস্থা খারাপ। মা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছে।

চুপ করে বসে রইল রুচি। সুব্রত। শান্তনু। বেশ কতক্ষণ বাদে রুচি বলল—আপনারাও তো দেখছি তাই। কিন্তু সকলে মিলে পাগল হব কী করে?

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—রমেনের কথা তুমি এত সহজে বাদ দিচ্ছ রুচি?

—স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে, স্বপ্নের কথা অত সহজেই বাদ দিতে হয়। এ-নিয়ে আপনারা দয়া করে কোনো কথা বলবেন না, দোহাই আপনাদের।

রুচির মুখখানা সবটা দেখা যাচ্ছিল না। আবছায়ায় ডুবে গেছে মুখটা। নাকের ওপর একটু আলো। কিন্তু চোখের ভাষা চাপা রয়েছে অন্ধকারে। ঠোঁট দুটোর কাঁপুনি বোঝা যাচ্ছে না। কথাগুলো যেন খসে খসে পড়ছে জলে।

—আমি অবিবাহিত মেয়ে। আমার বাবা মায়ের ভাবনা নেই আমাকে নিয়ে? তখন যা হয়েছে, হয়েছে, এখন ওকথা আর কেন?

—রুচি, একবার আমার জন্যে তোমার যাওয়া দরকার।

কেন?

—রমেনের মা এসেছিলেন আমার মায়ের কাছে। তখন আমি ছিলাম না। তিনি অনেক কিছু বলে গেছেন—

—জানি। সেসব কথা আমারও কানে এসেছে। কিন্তু—

—সমস্ত জটটা তুমিই খুলে ফেলতে পার। চল একদিন।

ওরা আবারও বসে রইল চুপ করে। শান্তনু নদীর দিকে তাকিয়ে, সুব্রত রুচির দিকে, রুচি আকাশের দিকে। নদী নারী আর আকাশ খনে খনে রূপ বদলায়—সুব্রত শেষে এই কথাটা ভাবল।

—যাবে?

—যাব।

আরো খানিকক্ষণ বাদে রুচি বলল—কবে যাবেন বলবেন। এখন যাই, অনেকক্ষণ এসেছি মা ভাববে। আস্তে আস্তে উঠে গেল সে। শান্তনু বলল—এখন ওঠা যাক। দিবারাত্রির চাকায় কোনো মন্থরতা নেই। কোনো পিছুটান নেই। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুব্রত অবাক হয়ে গেল—আজ আর রুচির ওপর সে আগের দিনের মতো অপ্রসন্ন নয়। বরঞ্চ কেন যেন তার মনে হচ্ছিল যে আজ সন্ধ্যাটায় সে কিছু একটা বুঝেছে। বেশি দেরি নয়, যাব—যত তাড়াতাড়ি হয় যাব।

মেঘ-মেঘ বিকেল। হয়তো এখনি বৃষ্টি নামবে।

নৈহাটী স্টেশনের কাছে সিনেমা-বাড়িটার সামনের বাসস্ট্যাণ্ডে সুব্রত অপেক্ষা করছিল। রুচি যে বাসে থাকবে সেই বাসটায় ও উঠে পড়বে। ও চাইছিল যাতে সিনেমার বিকেলের শো ভাঙ্গার আগেই রুচি এসে পড়ে। তা নইলে বড় ভীড় হয়। ওয়াটারপ্রুফটা একবার এ-হাতে একবার ও-হাতে বারে বারে হাত বদলে-বদলে ঘড়ি দেখে-দেখে সময় কাটাচ্ছিল সুব্রত। সামনে নৈহাটী স্টেশনে আপে-ডাউনে গাড়ি এলো, গেল। বোধহয় একটা পকেটমার ধরা পড়ল, একটা মেয়েকে দেখে কারা যেন মুখে আঙুল পুরে শিস দিল। সিনেমা হাউসটার ভেতর থেকে হাসির সোরগোল শোনা যাচ্ছে। মধুবালা আর দিলীপকুমার। বাসের সহিসের বিশাল হৈ চৈ দূর থেকে শোনা যায়। ভালো করে থামার আগেই ভেতর থেকে রুচি বলল—আসুন। সুব্রত উঠে রুচি যেখানটায় বসে ছিল তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রুচি বলল, ওয়াটারপ্রুফটা আমার হাতে দিন। রুচিও ছাতা নিয়েছে। সুব্রত দেখল রুচির মুখ চোখ লালচে। ও অভাবনীয় গম্ভীর। একটা সাধারণ শিথিল খোঁপা থমকে রয়েছে ঘাড়ের কাছে। শাড়িটা সাদা, পাড়টায় কালোর কোলে লালের আঁজি। সাদা ব্লাউজে লালের বুটি। চোখে কাজল নেই।

কানে দুলও নেই, খালি হাত। যেতে হবে খানিকটা। গৌরীপুর হাজিনগর পেরিয়ে হালিশহরের ক্রেগ্ পার্কের কাছাকাছি একটা জায়গায়। সারা পথ ওরা কোনো কথা বলল না। বাস টাইমিং-এর জন্য একবার দাঁড়াল। তারপর থামল ছুটল, ছুটতে ছুটতে থামতে থামতে। শুধু একবার সুব্রত বলল—কী গুমোট। রুচি অস্ফুট স্বরে বলল—বোধহয় বৃষ্টি নামবে।

রমেনদের বাড়ি গিয়ে ওরা যখন পৌছল তখন বিকেল হারিয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই। সুব্রত দেখল রুচির মুখ চোখ শান্ত হয়ে এসেছে। রমেনের ভাইঝিরা সুব্রতকে চিনত। রুচিকে দেখে একটু অবাক হলো। রুচিকে ওরা চিনত না। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, মাসিমা কোথায়? ওরা বলল—ভেতরে চলুন। যে ঘরে রুচির বাবা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছেন তার পাশের ঘরে ওরা গিয়ে ঢুকল। যেতে যেতে সুব্রত দেখল রমেনের বাবার শীর্ণ ভাবলেশহীন মুখখানা—কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী ভাবেন তিনি কে জানে?—একবার যেন চেঁচিয়ে ডাকলেন কাকে—আমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। বড় মেয়েটিকে রুচি জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মা কোথায়? ওরা বলল, মা রান্নাঘরে। রমেনের মা বেরুচ্ছিলেন কোথায়। বললেন—রাধানাথের মন্দিরে যেতাম একটু। তোমরা এসেছ ভালোই হয়েছে, বোস। ঘরে একা-একা মন টেঁকে না। মেয়ে তিনটে এদের বসিয়ে বোধহয় মাকে খবর দিতে গেল।

সুব্রত বলল, মাসিমা এর নামই রুচি।

—তুমি?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রুচিকে দেখতে লাগলেন রমেনের মা। ওর ছোট্ট কপাল, ছোট্ট নাক, ভাসা চোখ, পাতলা ঠোঁট আর মাজা-মাজা রঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। রুচির কপালে ঘাম জমতে লাগল। কাণ লাল হয়ে উঠল। আঁচলটা সরু কোমরে জড়িয়ে রেখেছিল। সেটা খুলে ফেলল রুচি। তারপর নত হয়ে প্রণাম করল।

—তোমার নাম রুচি?

—হ্যাঁ।

—আমায় রমেন তোমার কথা কিচ্ছু বলে নি। রমেনের সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল? চুপ করে রইল রুচি। খানিকক্ষণ বাদে বলল—গোলমালের সময় মাঝে মাঝে রমেনদা আমাদের বাড়িতে থাকতেন। সুব্রত ভেবেছিল রমেনের

মা কাঁদবেন। কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—সুব্রত আর রমেনের মধ্যে কার সঙ্গে তোমার কতদিন আলাপ?—রুচি বলল—রমেনদাকে আমি অনেক দিন ধরে জানতাম। আর···ইতস্তত করতে লাগল রুচি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রমেনের মা। বললেন—বলো।

—আপনি যা শুনেছেন তা সত্যি নয়।

—তুমি কী করে জানলে?

—আমার চেয়ে বেশি এটা আর কারো জানার কথা নয় বলে। মুখখানা লাল হয়ে গেল ওর। যেন জোর করে বলল।

—তুমি সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ, আমি বলছি আপনি যা শুনেছেন তা সত্যি নয়।

—সুব্রত,

—বলুন।

—বাবা, আমি তোমাকে মনে-মনে অনেক আকথা-কুকথা বলেছি যে—

—মাসিমা, আমি তাতে কিছু মনে করিনি।

—সুব্রত তুমি তার সঙ্গে ছিলে? ও কিছু বলেছিল, কারো কথা?

—ছিলাম। না মা, কিছু বলেনি।

ওরা আরো অনেকক্ষণ রমেনের গল্প করল। রুচি জড়িয়ে পড়ল না গল্পে। যতটা সম্ভব নিজেকে দূরে রেখে গল্পের সঙ্গে যোগ রাখল। ভূমেনবাবু অফিস থেকে এলেন। একবোঝা প্যাকেট, ওষুধ, বাজার নিয়ে ঘামতে-ঘামতে। ভূমেনবাবু এ ঘরে এলেন। সুব্রতকে দেখে খুশি হলেন। তিনি জানালেন যে কোনোদিনই ওসব ড্যাম্ লাই তিনি বিশ্বাস করেন নি। মায়ের মনটা কেমন আনব্যালান্সড হয়ে গিয়েছে। ভূমেনবাবুর স্ত্রী এলেন চা নিয়ে। সকলে গোল হয়ে বসল। চা পাঁপর ভাজা চলল। রুচির কথা আর কেউ জিজ্ঞাসা করল না। ভূমেনবাবু বললেন—বড় মেয়েটার জন্য একটা ছেলে দেখ না সুব্রত, আর তো রাখা চলে না। রমেনের মা রমেনের গল্প করতে পেয়ে খুশি, ভূমেনবাবু কী ভাবে সংসার চালাচ্ছেন এই বাজারে তাই বলতে পেরে সুখী। হালিশহরে ক্রেগ পার্কের কাছে নৈহাটীর মতো জনকোলাহল নেই। গঙ্গার ধারে গাছপালায় গ্রাম-গ্রাম নীরবতা। আর যেন উঠতে ইচ্ছে করছিল না। চাপা স্বরে রুচি বলল—এবার উঠুন। রমেনের মা রুচির চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। আস্তে আস্তে ওরা বিদায় নিল।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখল মেঘ জমাট বেঁধেছে। ওপারে ডানলপের আলো পড়েছে জলে। গঙ্গা নিথর। বড় বড় দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। ক্রেগ পার্কে অনেকে বেড়াচ্ছে। অনেকে বসে আছে। বাসস্ট্যাণ্ডে ভীড় জমেছে। শুনল বহুক্ষণ বাস আসে নি। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। সুব্রত বলল, একটা ফিরতি রিকসা নিই? রুচি বলল, তাই নিন। এদিকের রাস্তাটা নির্জন। রিক্সায় বসে রুচি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। কী ভাবছে কে জানে। সাইকেল রিকসার ভেঁপু বেজে চলল। ঘাম-চকচকে লোকটা জোরে প্যাড্‌ল করছে—রিকসার ছাউনিতে বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছে। খানিক বাদেই সাইকেল রিক্সা একটা জনাকীর্ণ শ্রমিক অঞ্চলে ঢুকল। রাস্তায় ভীড়। দুপাশে খাটিয়া পেতে অনেকেই শুয়ে পড়েছিল, এখন উঠে পড়ছে ধড়মড় করে। সাইকেল রিক্সার গতি মন্থর হলো। সামনে লরি স্টার্ট নিচ্ছে। এই সেই রাস্তাটা। রিক্সাটা দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ, এই ডানহাতি রাস্তাটা। সুব্রত বলল, রুচি। ও তাকাল। সুব্রত বলল, এই সেই রাস্তাটা, এইখানেই ওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, আর বোধ হয় ঐখানে—সুব্রত চুপ করে গেল। ও অনুভব করল রুচি ওর হাতটা চেপে ধরেছে। কাঁপছে। আর সেই রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। কাঁদছে। নিঃশব্দে। রিক্সাটা চলছে। বৃষ্টির ছিটে আসছে। বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে দিল রুচি। সুব্রত রুচির পিঠের ওপর হাতটা রেখে বলল, রুচি এটাই স্বাভাবিক এটা হওয়াই উচিত ছিল। সেই এতক্ষণের থমকে-থাকা খোপাটা এবার সুব্রতর হাতের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ল।

বৃষ্টি জোরে এসেছে। সুব্রত ওয়াটারপ্রুফটা রুচির হাঁটুর ওপরে ঢাকা দিল। নিজে ভিজতে লাগল।

রুচিকে বাড়ি পৌছে দিয়ে সুব্রত স্টেশনের সামনে ওদের বহুদিনের পুরনো রেস্তোরাঁটায় একবার গেল। সেই যেদিন ও কোর্টে সারেণ্ডার করবে মনস্থ করেছিল সেদিন সকালে এসে বসেছিল। তারপর ছাড়া পেয়েছে, বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু এখানে আসা হয় নি আর। আজ ভাবল একবার যাওয়া যাক। হয়তো শান্তনুর সঙ্গেও দেখা হবে। ওকে মোটামুটি ঘটনাটা বলবে। ও যখন গিয়ে পৌছল ওখানে তখনও বৃষ্টি ভাল করে ধরে নি। অথচ ভ্যাপসা গরমও কাটে নি। ভেতরটায় উজ্জ্বল আলো। বাইরে কাঁচের দরজার গায়ে লেখা, আসুন। বাসন্তী কমলা আর সবুজ সরবতে টইটম্বুর গ্লাসে স্ট্র পাইপ লাগিয়ে কেউ চুষছে। কেউ একখণ্ড কাটলেটে চামচে বসাচ্ছে—কাঁটাটা টেবিলে ফেলে রেখে। মানব এককোণে বক্তৃতা দিচ্ছে। শীর্ণ বিষণ্ণ শান্তনু শুনছে। সুব্রত ডাকল—শান্তনু।

(ক্রমশ)

বিবাহে কান্নাপর্ব

হিমাদ্রিশেখর বসু

মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার ব্যাপারটিকে নিয়ে বিদায়ের আগে একটি কান্নাকাটির পালা আছে: ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকভাষায়। ইদানীংকার ভারতীয় আর্যভাষার নানা শাখার সভ্যভব্য মাজাঘষা কৃত্রিম (sophisticated) রকমের আড়ালে আত্মগুপ্ত লোকভাষা 'ট্র্যাডিশনবর্জিত' শ্রুতির অগোচরে থাকলেও এর সঙ্গে নিত্যকারের নিগূঢ় যোগ—একটা সহজাত এবং সহজ নাড়ীর টান একদা মানুষের ছিল। অবাঙ্গালী ভাষায় প্রধানত কান্নাকাটির পালাটি প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গীতে, বাংলাভাষায় তার প্রকাশ যুগ্মভাবে, ছড়ায় ও গানে। অন্যান্য ভাষার তুলনায় যদিও তার ব্যাপ্তি বা প্রসারতা কম, তবু তা অনুভূতির দিক থেকে যথেষ্ট গভীর, সেকথা অগ্রাহ্য করা যায় না।

এই কান্নাকে অবলম্বন করেই এক একটি বিশেষ অধ্যায় বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন লোকসাহিত্যে গড়ে উঠেছে। উৎকল সংস্কৃতিতে এর নাম 'কান্দণা', মৈথিল ও ভোজপুরী লোকসঙ্গীতে 'সমদাউনি', 'বেটিকি বিদাই'। আর বাংলা ভাষায় একে বলা চলে 'কন্যা বিদায়ের ছড়া' ও 'বিজয়া গান'। বলা-বাহুল্য, বিজয়াগান-কে সম্পূর্ণত কন্যাবিদায়ের গান বলতে ঔচিত্যে বাধে, কারণ মেয়ের বিয়ের অব্যবহিত পরেই সেটি গাওয়া হয় বা বিবাহ ব্যাপারের সঙ্গে সবখানেই নিশ্চিত অচ্ছেদ্য-যোগ আছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। অথচ, আধ্যাত্মিকভাবে, কন্যাবিদায়ের দিক থেকে একটা ভাবগত ঐক্য আছে, সেটুকুও অনস্বীকার্য। 'কন্যাবিদায়ের ছড়া'—এই আখ্যাটি থেকে একথা সহজে অনুমেয় যে বাঙলাদেশের কন্যাবিদায়ের পালা নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নসূত্র লোক-কথিত মৌখিক-ঐতিহ্যের (Oral tradition) ধারক ছড়াগুলিকে নিয়ে একটি অধ্যায় কল্পনা করা যাচ্ছে, যা 'সমদাউনি' বা 'কান্দণা'র মতো সুপরিস্ফুট কোনো বিশেষ অধ্যায় নয়। তবু একই ধরনের লোকানুভূতিমূলক ভাবের বাহক, এই কথা মনে করে, ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয়

ভাষাভাষী লোক সংস্কৃতির একটি সমান্তরাল সাহিত্য ব্যাপার বলে মেনে নিলে কোনো ক্ষতি হয় না, বরং তুলনামূলক আলোচনার পটভূমিকায় একটি সুবিধার সৃষ্টি করে।

ভারতবর্ষের বাইরেও, অর্থাৎ বিশ্ব-লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কান্নাকে অবলম্বন করে বিশেষ বিশেষ কাব্য, সঙ্গীত বা নৃত্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে কান্না কন্যাবিদায়ের কান্না নয়, সাধারণত তা মৃত্যুর শোক। স্কটল্যাণ্ডের চারণকবিদের রচিত এবং গীত (Coronach)[১] মৃতের প্রতি স্তুতি গান। সম্প্রদায়কর্তা বা প্রধান কোনো ব্যক্তির (Clan-heads) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সাধারণত এই গান গাওয়া হতো। আয়ারল্যাণ্ডের Keen-ও[২] তাই। লোক-সংস্কৃতির পণ্ডিতদের মতে এই দুই রকমের গানেরই মূল হচ্ছে—ইদানীং অপ্রচলিত একধরনের স্তুতি-বিলাপ লোকসঙ্গীত যাকে আগে বলা হতো complaint[৩]। মেক্সিকোর লোকসাহিত্যে স-নৃত্য একধরনের সঙ্গীত ব্যাপার আছে যাকে বলা হয় Llorona[৪],—শব্দার্থ 'ক্রন্দনশীল'। মতিভ্রষ্ট একটি মা তার কোলের বাছাকে নিজেই মেরে ফেলেছে, তারই জন্যে আবার সে নিজেই নেচে নেচে অশ্রুপাত করছে। খোলা মাঠের অন্ধকারের মায়ায় সে তার বাছাকে আবার দেখতে পাচ্ছে। আজকাল লোকবিশ্বাসের ভিত ক্রমে টলে যাচ্ছে, তাই মেক্সিকোবাসীরা আর ওকে বিশেষ দেখতে পায় না, তবু সংস্কারী মনের আড়াল থেকে বেরিয়ে মাঝরাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে তার অদৃশ্য করুণ কণ্ঠ কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি রেওয়াজ আছে—অতিথি বা বিদেশাগত আত্মীয়দের কেঁদে কেঁদে অভ্যর্থনা করার (Weeping salutation)[৫]—শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে একসঙ্গে বসে কবরখানায় শোকপ্রকাশই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সমস্ত লোকসংস্কৃতিতে কান্নারপর্ব—মৃত প্রিয়জন বা স্বজনকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকভাষায় যে কান্নার পর্ব এখানে আলোচ্য, বিচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে হলেও তা মিলনোৎসবের অঙ্গ—হর্ষে বিষাদ : মৃত্যুর শোক নয়।

উৎকলসমাজে এই কান্নার পর্বকে বলে 'কান্দণা'। সুর করে করে, গান গেয়ে গেয়ে অশ্রুপাত। ভারতীয় সমাজের পল্লীবাস জীবনে এখনো ইংরেজী আচারের মিশ্রণে দোঁ-আঁস্‌লা সভ্যতার প্রভাব যে সম্পূর্ণ পড়ে নি, তার আভাস পাই দরিদ্র নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত গ্রাম্য সংস্কারগুলোর মধ্যে।

আধুনিকতার গুণে মধ্যবিত্তসমাজে এ-সবের প্রভাব ক্রমশই কমে যাচ্ছে। পল্লীর মেয়েটি বিয়ের পর দূরদেশে চলে যাবে। বিবাহ সংস্কারে একদিকে যেমন মিলনের আয়োজন, অন্যদিকে বিচ্ছেদের। নিজের আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে সে পাবে তার স্বামী আর স্বামীর ঘর, সেখানে তার নতুন জীবনের শুরু, কুমারী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এতকালের অভ্যস্ত জীবনের বাপ-মায়ের ভালোবাসা, নিজের আবাল্য সহচরীদের স্নেহাদর কিংবা গ্রাম-পরিবেশ—স্বপ্নের মতো তার স্মৃতির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে : আঙিনায় চৈত্রের রাতে কবে ফুল ফুটেছে, আকাশে ঝাঁক ঝাঁক ঝিকমিকে তারা, সখীদের নিয়ে চাঁদনী রাতে শিবমন্দিরে প্রদীপ সাজানো—সবই তার বার বার মনে পড়তে থাকে। খুব ছোট্টবেলায় কবে তার বাবা (ভাগ্যদোষে বাবা এখন বেঁচে নেই!) খেলার পুতুল ভেঙেছিল, সেজন্যে তাকে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছে। বাড়ির আদরের সোনার মেয়ে নিজের হাতে বাগানে গাছ বসিয়েছে, সারে সারে সেই গাছে ফুল ফুটে উঠেছে। পর্দা ঢাকা পাল্‌কী আজ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে, এখনই তাকে চলে যেতে হবে। মেয়েটির মনে হচ্ছে, বাপ-মা বুঝি তাকে সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে, মায়ের ঘরের আদর আর সে কি পাবে! এখন শুধু শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা!

নীচে কয়েকটি 'কান্দণা' ও তার অনুবাদ দেওয়া হলো। তা থেকে বিগত যুগের উৎকল পরিবারের একটি নিখুঁত ছবির আভাস পাওয়া যায়—

থালি মারি দেলে ছউল পানি, হে বোউ
দূরদেশ বন্ধু[৬] কে জিব আনি, হে বোউ।
দূরদেশ বন্ধু করিছ হাতে, হে বোউ
যে ফুল ফুটই চইত রাতে, হে বোউ
ফুল মউলই থরা তেজকু, হে বোউ
ঝিঅ মউলই কথা পদকু, হে বোউ
তুর রঢ়ুথিলা কাকর থাই, হে বোউ
মূত রঢ়ুথিলি ত স্নেহ পাই, হে বোউ।
নণ্ডা বরগছ দণ্ডাকু ছাই, হে বোউ
মোর কপালকু বাপা ত নাহিঁ, হে বোউ।
আকাশরে তারা জোড়িকি জোড়ি, হে বোউ।
আজি জিমি মুঁ গোপপুর[৭] ছাড়ি, হে বোউ।

উঠিলা স্থয়ারী[১] বসিলা নাহিঁ,   হে বোউ।
আউ গোপপুর দিশিব জাহিঁ,   হে বোউ*।

আমে লগাইলু ফুল জাগর[২]   মা আগো আমে স্থনা সাগর
ফুল শুখিগলে মালীর জিব,   মা আগো আমে স্থনা সাগর
আমে শুখি গলে মাআ কান্দিব,   মা আগো আমে স্থনা সাগর
কনঢেই খেলত বাপা ভাঙ্গিল   মা আগো আমে স্থনা সাগর
সাত তুট পানি বাপা চাখিলে   মা আগো আমে স্থনা সাগর
জেউ তুট পানি নিম-জহর   মা আগো আমে স্থনা সাগর
সেই তুটপানি কলে আহরে   মা আগো আমে স্থনা সাগর*

অনুবাদ—ও বোউ (মাকে সম্বোধন করে), তুমি বাসন মাজছো আর জল চলকে উঠছে। স্বামী আমার দূর দেশের, কে আমায় আনতে যাবে বলো? ও বোউ, তুমি আমায় দূরদেশী বন্ধুর (স্বামীর) হাতে দিলে! চৈত্রের রাতে ফুল ফোটে আর সেই ফুল শুকিয়ে যায় প্রখর রোদের ঝাঁঝে, মেয়েও তেমনি একটি সামান্য কথা সইতে পারে না। শিশিরের প্রসাদে দূর্বাঘাস বেড়ে ওঠে, আমি (মেয়ে) বেড়ে উঠি তোমার স্নেহে--ওগো বোউ, নেড়া বটগাছের ছায়া পড়ে পোড়ো জমির উপর, আমার কপাল দোষে, আমার কপাল-দোষে আজ আমার বাবা নেই। আকাশে ঝাঁক ঝাঁক তারা ফুটে উঠছে, ও বোউ, আজ আমি গোপপুর ছেড়ে চলে যাব। পর্দাঢাকা পাল্‌কী কাঁধে উঠেছে, আর নামছে না, গোপপুর আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আমি বাগানে ফুলের প্রদীপ সাজিয়েছি, ও মাগো, আমি সোনার সমুদ্দুর! ফুল শুকিয়ে গেলে মালীর ক্ষতি, আমি শুকিয়ে গেলে মা কাঁদবে! খেলার পুতুল ভেঙেছিল বাবা, সাতঘাটের জল চাখতে হয়েছে বাবাকে, সেই সব ঘাটের জল নিম-জহর (অর্থাৎ বিষতিক্ত)।

করিথিলা মোতে কেড়ে গেহলাই,   মঁা গো
আজি সমুদ্রে দিঅ ভসাই,   মঁা গো
ঢেঁঙ্কিরে কোটিলে চুনা,   মঁা গো
মা ঘরে ঝিঅ কাণর স্থনা,   মঁা গো
শাশুঘরে হুয়ে চুণা,   মঁা গো*

অনুবাদ—মাগো, আমাকে কত আদরের পাত্রী করে তুলেছিলে, আজ

(কিনা) সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও, (তুমি) ঢেঁকীতে চুণ কুটলে? মায়ের ঘরে মেয়ে হচ্ছে কানের সোনা, কিন্তু শ্বশুরঘরে সে তো চুণ!

আবার কখনো কখনো মেয়েকে সম্বোধন মায়ের বেদনা :

আম্ব গছ ডালে রাবই পিক,   মো স্থনা ফুল।
সেহি পরি তোর মধুর ডাক,   মো স্থনা ফুল।
শিব শিরে চম্পা চঢ়াই থিবি,   মো স্থনা ফুল।
নিতি নিতি শুভ মনাস্থ থিবি,   মো স্থনা ফুল।†

অনুবাদ—ও আমার সোনার ফুলরে, আম গাছে (আজ) কোকিল ডাকছে, এইরকম মিষ্টি তোর কণ্ঠের স্বর, আমি শিবের মাথায় চাঁপা দিয়ে পুজো করব, নিত্য শুভ মানত করব।

মেয়ে বলছে তার মাকে সম্বোধন করে :

বাপা যাইথিলে তোটামালকু   মা আলো মোর
ধরি আনিলে এ বুঢ়া বরকু   মা আলো মোর
টাঙ্গরি মুণ্ডরে পাগ ভিড়িচি   মা আলো মোর
দান্ত নাহিঁ গুআ ছেঁচি খাউচি   মা আলো মোর*

অনুবাদ—মাগো আমার, বাবা গিয়েছিল জঙ্গলে, ধরে এনেছে এই বুড়ো বরকে, (ও) টাকের উপর পাগড়ি বেঁধেছে, দাঁত নেই (তার) পান ছেঁচে খায়।

আমাদের—'তোর কপালে বুড়ো বর, আমি করবো কি'! কিংবা, 'বর এসেছে তামাক খেগো বুড়ো'—এই সমস্ত ছড়ার ভাবের প্রতিধ্বনি আসে উপরের কয়েক ছত্র গান থেকে।

হিন্দি লোকভাষায় কন্যা-বিচ্ছেদমূলক সঙ্গীত আছে, 'সমদাউনি'। সমদাউনি মৈথিল ভাষায় রচিত—অবশ্য মুখে মুখেই সে রচনার প্রসার। ভোজপুরী হিন্দিতে 'বেটি কি বিদাই' নিয়ে যে গান আছে, তাকেও সাধারণ ভাবে সমদাউনির সমগোত্র বলা যায়। যদিও ভোজপুরী লোকসঙ্গীতে এই ধরনের গান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হিন্দি লোকসাহিত্যে আপনার স্থান করে নিতে পেরেছে। মৈথিল সমদাউনির বিষয়বস্তু সীতার বিবাহান্তিক অযোধ্যাযাত্রা। মৌলিক কোনো সুখ-দুঃখের বিষয়কে অবলম্বন করে নয়। সুতরাং কন্যার

পিতা হচ্ছেন রাজা জনক, মাতা হচ্ছেন জনক-মহিষী, আর জামাতা হচ্ছেন, রঘুবংশী রাম। হিন্দিভাষী সমাজে রামায়ণের প্রভাব অনস্বীকার্য। ক্রমে ক্রমে রাজকন্যা সীতার আড়ালে আমাদের ঘরের মেয়েটি আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে, জনক-মহিষী তথা জনক তারই স্নেহশীল পিতামাতা ছাড়া কেউ নয়। নীচে একটি বহুল প্রচারিত মৈথিল সমদাউনি ও তার অনুবাদ দেওয়া হলো :

বড়রে যতন সে হম সিয়াজীকে পোসলো
সেহো রঘুবংশীনে নে জায় আহে সখিয়া
রানী জে রোয়ই রামা রোয়ই রানী বস্‌ওয়া
রাজা জে রোয়ই দর্‌বজওয়া হে সখিয়া
হাথী জে রোয়ই রামা রোয়ই হাতী সর্‌ওয়া
ঘোড়া যে রোয়ই ঘোড় সর্‌ওয়া হে সখিয়া
টোলা অো পরোস মিলি অওর্‌ সব রোয়লৈঁ
রোয়ই নগরিয়াকে লোগ আহে সখিয়া
মিলি লিঅ মিলি লিঅ সংগ্‌কে সহেলিয়া
অব্‌ নে অয়তন সিয়া রাজ আহে সখিয়া।[১০]

অনুবাদ—হে সখী বড় আদরে আমাদের সীতাকে পালন করেছি, সেই সীতাকে আজ রাম নিয়ে যাচ্ছে। রাণীমহলে কাঁদছেন রাণীরা, রাজা কাঁদছেন দরজায় দাঁড়িয়ে। কেঁদে কেঁদে উঠছে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। পাড়াপড়শী আর সারা গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়েছে, কাঁদতে কাঁদতে। হে সখী চল যাই, আমরা সীতার কাছে বিদায় নি, সীতা আর (বাপের বাড়ি) ফিরে আসবে না।

ভোজপুরী লোকসঙ্গীতের সমদাউনি কিন্তু সম্পূর্ণত 'বেটি কি বিদাই'। এই সঙ্গীতের অন্তরাল থেকে যে ছবিটুকু ফুটে ওঠে তা হচ্ছে নিছক বিহারী গ্রামাঞ্চলের ছবি, দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের নিজস্ব সুখ-দুঃখের কথা। সেখানে আর রাম-সীতার প্রয়োজন হয় নি, মনের দুঃখটি তারা আপন ভাষাতে সহজভাবেই প্রকাশ করেছে। নিচের কবিতাগুলি ও তার অনুবাদে তাই-ই প্রকাশ পাচ্ছে—

ছোড়ু ছোড়ু ভইয়া ডাঁড়িয়াবা ঘরে জায়ে দে দেউ,
সাতো লউড়িয়াঁকে ভারবা এগো হমারী নাহী।[১১]

অনুবাদ—আমার পালকী ডাঁড়ি ছেড়ে দাও ভাই, আমি ঘরে (শ্বশুরবাড়ি) যাই, সাত-সাতটা লোউড়িয়াঁর (মজুরনী ঝির) ভার তুমি বইতে পার, কিন্তু আমার একলারটা পারলে না!

আবার মাকে সম্বোধন করে মেয়ে বলছে :

হামারা হী বসিয়া কে আমা ধরিহ বার বার।
হামারা হী কেন্‌ওয়াকে আমা কীনীহ ধেহু গায় ॥[১২]

অনুবাদ—ওমা, আমাকে যে বাসীভাত দিতে (এত লাঞ্ছনা), তা এবার তুলে তুলে রেখে দাও। আমার জন্যে ফুল-ফল কিনতে যা (পয়সা) লাগত তাই দিয়ে দুধেল গাই কিনো।

অতি দুঃখের বিদায় দিনে মা ও ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে নিগূঢ় অভিমানটুকুও সহজ গ্রাম্যভাষায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বাংলা লোকসাহিত্যে কন্যাবিদায়ের ছড়া বা গান সংখ্যায় স্বল্প, কিন্তু একটি স্বতঃস্ফূর্ত বা অনায়াস গভীরতা সেগুলির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিচের ছড়াটি লক্ষণীয় :

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে॥
মাসী কাঁদেন মাসী কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই যে মাসী ভাত দিয়েছেন পাথর সাজায়ে॥
পিসী কাঁদেন পিসী কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে পিসী দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা ভরিয়ে॥
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন ভাতারখাকী বলে॥

বাংলা দেশের তেরো পার্বণের যত উৎসব তার মধ্যে দুর্গাপূজাই প্রধান। মহাশক্তিরূপিনী দুর্গা তত্ত্ববাস ছেড়ে আমাদের অজ্ঞাতসারে লোকচেতনায় মা

ও মেয়ের রূপ নিয়ে বসেছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঙ্গালী ধর্মসংস্কারেরর অন্যতম মূল সূত্র হচ্ছে দুর্গানাম। এই দুর্গা যেমন আমাদের দুর্গতিনাশিনী আশ্রয়দায়িনী মা, তেমনি কোলের আদরিণী মেয়েও বটে। সেইজন্যেই রূপে, গুণে, ভাগ্যে মেয়ে আমাদের দুর্গা, অন্নপূর্ণা। দুর্গোৎসবের উৎসব অধ্যায়টি, এক হিসেবে বাঙ্গালী সংসারের কন্যাবিদায়ের রূপক বলা যেতে পারে। সুতরাং কন্যাবিদায়ের মূল ধুয়ো হচ্ছে—"আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।' লোকসঙ্গীতের দিক থেকে বিচার করতে গেলে আমাদের 'বিজয়াগান'-ও তাই। হিন্দি ভাষার শাখা উপশাখায় যে কন্যারূপিণী সীতার বিদায়, তাতে রামায়ণের কাহিনী, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বঙ্গভাষী বঙ্গবাসী তথা বঙ্গসংস্কৃতির বাহক শিব-দুর্গার কাহিনীও তেমনি সমান গুরুত্বময়। তবু আমাদের দুর্গার সঙ্গে মৈথিল সমদাউনির সীতার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। কারণ সীতাবিদায়ের দিনের যে ছবি সমদাউনির গানে ফুটেছে, তাতে অন্য সব কিছুর সঙ্গে রাজ-অট্টালিকা ও রজৈশ্বর্যের ছায়াপাত ঘটেছে। রাণী কাঁদছেন রাণীমহলে, বিলাপী রাজা দাঁড়িয়েছেন প্রাসাদতোরণে, বর্ণনার একপ্রান্ত এসে ছুঁয়ে গেছে হাতীশালা ঘোড়াশালাতে। কিন্তু বাঙ্গালী দুর্গার বিবাহান্তিক কন্যাবিদায়ের যে বর্ণনা তা বাঙালী সংসারের আপন ঘরের ছবি, মা সেখানে নিজের বাড়ির উঠোনের ধুলোয় লুটিয়েই কাঁদছেন, রাজ-অট্টালিকার জনক-মহিষী এক্ষেত্রে নেমে এসেছেন আমাদের ঘরের শাঁখা-সিঁদুর-পরা মায়ের রূপে, যিনি পলাকাঠির হারে মেয়ের গলা সাজিয়েছেন। এমনি করেই গোটা পরিবারের মনটি কেঁদে উঠেছে। বাপ-মা ছাড়াও সমগ্র পরিবারের স্নেহগ্রন্থিবদ্ধ প্রত্যেকটি পৃথক পরিজনের ব্যক্তিগত যোগের খুঁটিনাটি পরিচয়—কে ভাত দিয়েছেন, কে দুধ দিয়েছেন, আর কে মর্মভেদী শ্লেষের সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ অন্তরটিকে দিয়ে রেখেছেন, বিচ্ছেদের দিনে সবচেয়ে বড় করে সেইটেই ফুটে উঠেছে।

বিচ্ছেদের মুহূর্তে বিচ্ছেদের দুঃখ সর্বত্রই বাজে, কিন্তু অতিবড় গভীর স্নেহই কেবল পরিপূর্ণ অন্তরে ভবিষ্যৎ জীবনে আশঙ্কার ছায়াপাত ঘটায়। মৈথিল বা ভোজপুরী বা উৎকল লোকসাহিত্যে কন্যাবিদায়ের দুঃখের মধ্যে আসন্ন বিচ্ছেদবেদনাটুকুই বড় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে বাঙালী মায়ের মন সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে, বলা যেতে পারে। কোলের মেয়েটি যখন

মার বুক ভরে তুলে ঘরের আলো হয়ে সবেমাত্র মর্ত্যে এসেছে, সেদিনই বিদায়ের সুরটুকুও, নিরুপায়ের সান্ত্বনাটুকুও, সেই সঙ্গে, একমাত্র বাংলা ছড়াতেই ধ্বনিত হয়েছে :

দোল দোল দুলুনি। রাঙা মাথায় চিরুনি ॥
বর আসবে এখনি। নিয়ে যাবে তখনি ॥
কেঁদে কেন মর। আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর ॥

'বিজয়া গান'-এর কন্যাবিদায়ের সুর নিচের উদ্ধৃত গান কটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় :

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না ॥

কিংবা,

শুনহে অচলরায়, বলো গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাবো না উমায়, দিগম্বরে যেতে বলো।

কিংবা,

আমার গৌরীরে লয়ে যায় হর আসিয়ে,
কি করছে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে।

সহজেই বোঝা যায় যে এ-বিদায়ের কথা, বাসী-বিয়ের দিনের বিদায় নয়। এ অনন্তকালের মায়ের মনের কথা। ভোজপুরী ও উড়িষ্যার লোকসঙ্গীতের পরিণতির এক হিসেবে মিল পাওয়া যায়, তাতে উভয় সমাজেরই সাধারণ লোকজীবনের ছবি ফুটেছে। মৈথিল সমদাউনির সঙ্গে বরং বাংলা বিজয়া গানের একটা মিল পাওয়া যায়, সেটি অংশত রূপগত এবং রূপকগতও বটে। বিজয়া গানের শিব-দুর্গা এবং সমদাউনির সীতা-রাম, কন্যা-জামাতার সূচক। মার কাছ থেকে শিব কাড়ছেন দুর্গাকে, সীতাকে নিয়ে যাচ্ছেন রাম, জনক-মহিষীর কোল থেকে। বিজয়া গানের কাহিনী আছে একটি, তাকে অবলম্বন করেই মা-মেয়ের দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। সমদাউনির অবলম্বন রামায়ণকাহিনী, সে কথার আগেই উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সমদাউনির গান বিবাহ-উৎসব সম্পর্কেই গীত। 'বিজয়াগান' বাংলা

দেশের বিশেষ এক উৎসবান্তে দুঃখের রেশ হলেও, এবং কন্যা-জামাই-এর প্রতি তীর্যক ইঙ্গিত থাকলেও তা আদপেই বিবাহান্ত গানের পালা নয়। সে-হিসেবে মৈথিল 'সমদাউনি', ভোজপুরি 'বেটি কি বিদাই' বা ওড়িয়া 'কান্দণা'—এই বিশেষ পর্বকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

(১) Dictionary of Folklore : পৃঃ—২৫৩। (২।৩) ঐ ; .পৃঃ ২৪৫ (৪)—ঐ ; পৃঃ ৬৩৯

(৫) ঐ ; পৃঃ—১১৬৯।

(৬) দূরদেশ বন্ধু—স্বামী অর্থে।

(৭) গোপপুর—ইঙ্গিতার্থে বাপের বাড়ী। (৮) পাল্কী, পর্দায় ঘেরা।

(৯) জাগর—মাঘ শুক্লপক্ষে উৎকল ব্রতচারিণীর শিবমন্দিরে প্রদীপ সাজিয়ে রাত্রি জাগরণের পালা 'জাগর' নামে খ্যাত।

(১০) মৈথিল লোকসঙ্গীত—রাম ইক্‌বাল সিংহ—পৃঃ ১৯১

(১১) ভোজপুরী লোকসঙ্গীত—কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়—পৃঃ ৭২

(১২) ভোজপুরী লোকসঙ্গীত ঐ —পৃঃ ৭৩

* A Study of Orissan Folklore—Kunjabehari Das,—pp.—134.

* পল্লীগীতি সঞ্চয়ন—ডাঃ কুঞ্জবিহারী দাশ—পৃঃ ৬৪

† " " —পৃঃ ৬৯

* " " —পৃঃ ৬৯

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গোপাল হালদার

অকস্মাৎ দার্জিলিঙে এসে রাহুলজীর সত্তর বৎসরের ঘটনাবহুল জীবনযাত্রায় যতি পড়ল।

রাহুলজীর সঙ্গে শেষ দেখা গত ২৩শে মার্চ, ১৯৬৩ ইং। পরদিনই দার্জিলিঙে যাচ্ছেন, বন্ধুবর মহাদেব সাহা ফোনে কথাটা জানালেন। সুবুদ্ধি হলো—দেরি না করে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। তখনো জানি না এই শেষ সাক্ষাৎ। সুদীর্ঘ, সুগঠিত দেহ শয্যাশায়ী, কথা বলতে অশক্ত। মহাদেবজী আমার নাম বললেন, চিনতে পারলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রত্যেকটি পুরনো পরিচিত মুখ দেখলেই কিছুকাল যাবৎ তিনি বিচলিত হন। অন্তরে আলোড়ন জাগে, অশ্রু চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে পড়ে, মুখ অব্যক্ত ক্রন্দন-বেদনায় কাতর হয়। কিন্তু স্মৃতির যে দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তা কি আর খোলে? রাহুলজীর পত্নী কমলা দেবীর কথা তাঁর কানে যায়, তিনি তা বোঝেন। হয়তো তাঁকে দেখতে অভ্যস্ত বলেই জানেন, চেনেন। মস্কোর চিকিৎসায় তাঁর কিছু দৈহিক উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু মস্তিষ্ককোষের যে প্রদেশ নিঃসাড় সেখানে চেতনাসঞ্চার আর সম্ভব নয়। মহাপথিকের পা এবার অচল। মহাপণ্ডিতও আর ফিরে আসবেন না—আজমগড়ের পনঠা গ্রামের কেদারনাথ পাণ্ডের নাম ও স্বজনস্মৃতিই চেতনায় জাগ্রত। স্ব-আহৃত পরিচয়ের এই ক্ষয় তবু জীবন মেনে নিতে চায় না—তাই তাঁর এই বেদনা, যন্ত্রণা, অশ্রুপাত।

দেহ ও অনুভূতির এই দ্বন্দ্ব থেকে রাহুলজী এত শীঘ্র মুক্তি পাবেন, সেদিনও তা মনে হয় নি॥

রাহুলজীকে প্রথম দেখেছিলাম কবে মনে আছে। কিন্তু দেখার আগেও আছে দেখা। তা শোনা। শোনাও একটা রূপ নেয়। তাই বোধহয় স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের 'মডার্ন রিভিয়ু'র (?) লেখাতেই তাঁকে প্রথম

দেখি। তবে আগে শুধু শুনেছি। ইংরেজি কথাগুলো মনে নেই, মর্মটা আছে। জয়সওয়াল মহোদয় বলছেন : "রাজনীতি ছেড়ে ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে এই অসামান্য পণ্ডিতকে আত্মনিয়োগ করতে আমি প্ররোচিত করেছি; জানি না তাতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় এক জওহরলালকে হারাল কিনা"। জয়সওলালের মুখের এ কথার মূল্য বুঝতাম। তাই চমকিত হয়েছিলাম, চমৎকৃতও হয়েছিলাম। পাটনা আমার অপরিচিত নয়, পাটনা মিউজিয়াম তো বিশেষ প্রিয়। তিব্বত থেকে সংগৃহীত 'রাহুল সংগ্রহের' তখনো প্রাথমিক ঝাড়াই-বাছাই সম্পূর্ণ হয় নি। সিংহল, জাপান ছাড়াও তৃতীয়বার তিনি তিব্বত অভিযান সম্পূর্ণ করে ফিরছেন। ২০০ খচ্চরের পিঠে সেই পুঁথি ও পট নিয়ে যে মহাপণ্ডিত স্বদেশে ফিরেছেন তখনো তাঁকে দেখতে পাই নি, সে সংগ্রহও না। অল্পদিন পরেই শুনলাম তাঁর কথা আবার। জয়সওয়ালের আশঙ্কা অমূলক—ভারতবর্ষ মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নকেও হারায় নি, 'দ্বিতীয় জওহরলালকেও' না। তবে এ জওহরলাল পুনরাবির্ভূত হলেন রাজনীতির বামমার্গে—বৌদ্ধশ্রমণের পীতাবাসের মতোই তিনি পেরিয়ে এসেছেন রাজনীতির পূর্ব-প্রস্থান। মাঝখানে অবশ্য গিয়েছিলেন সোভিয়েত ভূমিতে। আর সেখানেই তাঁর ধর্মান্তর ও পথান্তরের সূচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণে। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবার বিহারের অগ্নিগত কিষাণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। কংগ্রেস তখন রাজা হয় নি, মন্ত্রিত্বের গদিতে প্রথম বসেছে। জমিদাররা ছিলেন গ্রামের রাজা; এখন সেই সঙ্গে হয়েছেন প্রদেশের মন্ত্রী। রাহুলজীর মাথা লাঠিয়ালের লাঠি বেছে নিতে দেরি করলে না—রক্তক্ষরণের পরিশেষে পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে শহরের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে জেলহাজতে পুরল মহাপণ্ডিত রাহুলজীকে—জয়সওয়ালের 'দ্বিতীয় জওহরলালকে'। আর তিনি যখন জেলে তখন তাঁর রুশপত্নী ও সদ্যোজাত পুত্র ঈগোরের ফটোগ্রাফ ছাপিয়ে বিলি করতেও দেরি করলেন না বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল—মানুষটাকে হেয় করতে হবে সাধারণের চোখে সাধারণের সংস্কারের সুযোগ নিয়ে। একখানা হিন্দী মাসিকপত্র থেকে রাহুলজীর পত্নী ও শিশুপুত্রের সে ছবি আমিও দেখতে পাই। কিন্তু রাহুলজীকে তখনো চোখে দেখি নি।

চোখে রাহুলজীকে দেখলাম প্রথম কলকাতার বৌবাজারে কিষাণ-সভা অফিসের তেতলায় একটি বৈঠকে। তখন মহাযুদ্ধের মহাক্ষণ—'কুইট

ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব গৃহীত হতে মাত্র দিন পাঁচ বাকি। কী হবে তার রূপ—সমস্ত দেশ চঞ্চল। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসে সে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ রূপ মাত্র দিন দুই পূর্বে আলোচিত হয়েছিল—স্বয়ং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন তাতে সভাপতি। সভ্য হিসাবে রাহুলজীও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে আলোচনা নিয়ে এখন কথা বলা অনাবশ্যক। তবে যা কিছু পরে বিহারে ঘটে—টেলিগ্রাফের তারকাটা, রেললাইন ওপড়ানো—গান্ধীজীর তা অননুমোদিত হলেও—বিহারের কোনো কংগ্রেস নেতার কাছে তা পূর্বাহ্নে অজ্ঞাত ছিল বলা চলবে না। রাহুলজী সভার সে আলোচনার কথা বলছিলেন—অতি সরল হিন্দী ছোট ছোট বাক্যে, সহজ অনাড়ম্বর কথা। মৃদুকণ্ঠ, স্মিতহাস্য, প্রসন্ন মুখ—এই দীর্ঘ সুগঠিত বিনয়নম্র পুরুষই মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। হিমালয়ে তিব্বতে যিনি এমন দুঃসাহসে ভ্রমণ করেছেন, তাঁর দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের কথা দেখে জানতে হয় না। অনেক শোনা, অনেক মনে-মনে দেখা এ সবই—তথাপি একটা বিস্ময়। লৌহ ও ইস্পাতে গড়া মানুষ যে এমন প্রসন্নচিত্ত, বিনয়ী, মৃদুভাষী মানুষ—তা কল্পনায়ও ভাবতে পারি নি তার পূর্বে। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং, তা আরও এক-আধ ক্ষেত্রে দেখেছি; এই দেখলাম পৌরুষো দদাতি নম্রতাং।

বৎসরখানেক পরে আমি তখন পীড়িত। রাহুলজীকে আবার দেখলাম—তিনিই আমাকে দেখতে এসেছিলেন। বাড়িতে দাদা (রঙীন হালদার) ছিলেন, পুজোর ছুটি। প্রায় ঘণ্টা দুই নানা বিষয়ে কথা হলো। 'সোভিয়েত ভূমি' আমি সযত্নে পড়েছিলাম। কখনো সে বই-এর উল্লেখিত কোনো বিষয় নিয়ে, কখনো ভারতীয় দর্শনের কোনো তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। বিশেষ করে কথা হয় ধর্মকীর্তির সম্বন্ধে, আর প্রতীত্য-সমুৎপাদ বিষয়ে। তেমনি সহজ মধুর তাঁর কথা, বিনীত স্বভাব, প্রসন্ন মূর্তি।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্বন্ধে এইটিই আমার প্রথম ও প্রধান অভিজ্ঞতা। পৌরুষব্যঞ্জক দেহের সঙ্গে প্রসন্ন মুখশ্রী, বিদ্যার সঙ্গে বিনয়ের সমাবেশ, স্বচ্ছ বুদ্ধির সঙ্গে সনম্র বাক্‌ভঙ্গির।

বহুবার রাহুলজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে—বোম্বাইতে, বারাণসীতে, পাটনায়, কলকাতায়। একবার কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে পেলাম না। পরদিন তিনিই এসে আমাদের বাড়ি উপস্থিত। কোনোখানে মনে হবে না তিনি কর্মব্যস্ত মানুষ, পঠন-পাঠনে অহর্নিশি

নিরত—সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। ভদ্রতায়ও যেমন, হৃদ্যতায় তেমনি—অসাধারণ হয়েও সাধারণ। বারাণসীর সে দিনটির কথা মনে পড়ে। অমৃত রায়ের গোধুলিয়ার বাড়িতে ছিলেন। শীতকাল, আমি শীতে জড়সড়। রাহুলী শেষরাত্রিতে উঠে কোথায় যেন যাবেন—বিশেষ শীতবস্ত্রের প্রয়োজনও তাঁর নেই। তখন তাঁর বয়স ষাটের দিকে। আমি তাঁর দীর্ঘ সবল দেহের দিকে তাকিয়ে দেখছি—আর মনে-মনে তাঁর স্বাস্থ্যের প্রশংসা করছি। বুঝি নি, তাতে কখনো ক্ষয় ঘটতে পারে। আরও পরেকার কথা; কলকাতায় বড়বাজারে পাহাড়ীয়া বন্ধুদের গৃহে তিনি তখন অতিথি—মুসৌরিতেই সস্ত্রীক থাকেন। শুনেছিলাম, বহুমূত্ররোগে তাঁকে ধরেছে। বসে-বসে তাঁর কাজের কথা শুনছিলাম—সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করতে চান কী সংকলনে; হিন্দী কবিতার ও উর্দু কবিতার বহু খণ্ড সংকলন তার পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। মূল আলোচ্য সেবার ছিল বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ বিষয়ে। ও-গ্রন্থে আমার প্রবেশ অসম্ভব, ও-তত্ত্ব আমার অনধিকার চর্চা। অবশ্য সঙ্গদোষে কিছু-কিছু শুনতে হয়েছে; কারণ না হলে গৃহত্যাগ করতে হতো। রাহুলজী ও-গ্রন্থের যে পুনরনুবাদ সংস্কৃতে দাঁড় করিয়েছেন আমার স্ত্রী তা নিয়ে প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। সে বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসাই ছিল নিবেদন করবার কথা। সে সূত্রে আমার মহাযান বৌদ্ধধর্মের নানা তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হলো সেদিন। কথার বাহুল্য ছিল না। রাহুলজী সরল ছোট কথায় বড় তত্ত্বকে সহজবোধ্য করে দিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি তো আর দুর্মেধসকে মেধাবী করতে পারেন না। আমি যা বুঝলাম—রাহুলজীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অক্ষুণ্ণ। না হলে, অতগুলি বিষয়ে অত বই তৈরি করছেন কি করে? অদম্য তাঁর শক্তি—মানসিক ও দৈহিক।

কিছুদিন পরেই কিন্তু সে ভুল ভেঙে যায়। পাটনায় ডাঃ অজিত সেন বললেন, "এ ভালোই—রাহুলজী জানেন না তিনি কতটা অসুস্থ"। রক্তের চাপ, হৃদযন্ত্রের শিথিলতা সবই তখন প্রকট হচ্ছে। তখনো আর-একবার তিনি তিব্বতের উদ্দেশ্যে চীনযাত্রা করছেন শুনে বললাম, এ মানুষ ভাঙবে, মচকাবে না। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই তাঁকে ফিরে আসতে হয় সেবার। তারপর মহাদেবজীর মুখে বরাবর জানতে পেরেছি পীড়িত রাহুলজীর মুসৌরিতে দুর্বিপাকের কথা, ভগ্নস্বাস্থ্যের ক্রমাধোগতি, মানসিক

অবসাদ, বৈষয়িক দুশ্চিন্তা, নতুন পত্নী ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ-ভাবনা। মহাপণ্ডিতের বিষয়বুদ্ধি সাধারণের অপেক্ষাও কম হয়, এ কথা তো মিথ্যা নয়। মুসৌরির বাড়ি সস্তায় বিক্রী হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের দার্জিলিঙে স্কুলে ভর্তি করে দেন, রাহুলজী কতকটা বৈষয়িক প্রয়োজনেই যান সিংহলে অধ্যাপনার শেষ কাজ নিয়ে। বৎসরাধিক পূর্বে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তাঁর স্মৃতির বিলোপ ঘটে। দেহও প্রায় অচল হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য মস্কোতে যাবার কথা হয়। গত বৎসর লেনিনগ্রাদে দেখেছি তাঁর পূর্বতন ছাত্র ও সহযোগীরা তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন। বারবার জিজ্ঞাসা করতেন—কোথায় তিনি? আরোগ্যের কোনো আশা কি নেই? দেখছিলাম রাহুলজীর প্রতি তাঁদের আন্তরিক মমতা ও শ্রদ্ধা, তাঁর জন্য সমবেদনা। তাঁর স্বভাবের অকৃত্রিমতা সকলেরই অন্তর স্পর্শ করত।

রাহুলজীর পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা আমার কাজ নয়। ভারতবিদ্যায় তিনি মহাপণ্ডিত, বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনি 'ত্রিপিটকাচার্য', এ কথার অর্থ বুঝবার মতো। কিন্তু রাহুলজীর বিদ্যা তো শুধু এই বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। অতীত বিদ্যাকেও তিনি চূড়ান্ত করে মানেন নি এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস শুধু অতীতের কথা নয়, বর্তমান ছেড়ে আগামী দিনেরও ভূমিকা, তিনি এ সত্য জীবনে গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি পুরাতাত্ত্বিক নন, বর্তমানের নির্মাতাও। বিশ্বময় গতির ছন্দে তিনি পা মিলিয়েছেন. বৈষ্ণব মোহান্ত, আর্যসমাজী প্রবর্তক, বৌদ্ধ ভিক্ষু—তিনি সব উত্তীর্ণ হয়ে এসে গ্রহণ করেন গতিবাদী জীবনধর্ম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। কমিউনিজমই তাঁর ধর্ম হয়ে ওঠে। কমিউনিজম এই অসাধারণ মানুষকে আরও সাধারণ হতে শিক্ষা দেয়।

১৭০ খানার উপর বই-এর রাহুলজী লেখক। তার মধ্যে ভারতবিদ্যার গবেষণা থেকে সাধারণ মানুষের জন্য সরল করে লেখা দর্শন। দিগ্‌দর্শন, বিশ্বের রূপরেখা, কথাশিল্প রূপে লেখা 'ভোলগা থেকে গঙ্গা', 'মানব-সমাজের ইতিহাস', 'মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস' ইত্যাদি ইত্যাদি কত কী যে আছে গণনা করা যায় না। পুস্তকপঞ্জীও বোধহয় মহাদেবজী ছাড়া কেউ তৈরি করতে পারবেন না। সবই প্রায় হিন্দীতে লেখা; কিছু বিচার আছে সংস্কৃতে পালিতে। হিন্দী পাঠককে তিনি প্রায় বিশ্বজ্ঞানের চাবিকাঠি দিয়ে গিয়েছেন। এমন কাজ বাঙলার জন্য কেউ করেন নি। করবার মতো

যোগ্যতা কারো আছে কিনা জানি না; সাহস ও সংকল্প নেই, তা জানি। হিন্দী পাঠককে তাই হিংসা করি। হিন্দী আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়ি। আমরাও কি তবু তাঁর কাছে এজন্য কম ঋণী? তাঁর হিন্দীতে আটকাতে হয় না। সংস্কৃতের শিলাখণ্ড নেই, ফারসির কাঁটাগাছও নেই। স্বচ্ছ, সরল, গঙ্গাজলের মতো এ স্টাইল একটি মানুষেরই স্বভাবের প্রতিরূপ। আমার কাছে বিশেষ করে উপাদেয় তাঁর ভ্রমণকথাসমূহ।

মহাপণ্ডিত রাহুল ছিলেন মহাপথিক রাহুল। তাঁর মনীষা, তাঁর কর্মশক্তি মহাপণ্ডিত্যের যোগ্য। কিন্তু তাঁর গতি-প্রাণতা আর অকৃত্রিমতা তাঁকে পথ থেকে পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে; কোথাও থামতে দেয় নি—পাণ্ডিত্যও নয়। তাঁর উপদেষ্টা জয়সওয়ালের ভয় ছিল অকারণ। রাহুলজী জওহরলাল হতে পারতেন না। জওহরলাল জানেন গতিরও মাত্রা আছে। কখন গান্ধীজীর টানা মাত্রাটাতে গতিকে সংযত করতে হবে, কখন মাউন্টব্যাটনের মাত্রায় তা পরিবর্তিত করাও দরকার। এ মাত্রাবোধও অকৃত্রিম। রাহুলজীর কাছে কিন্তু মাত্রাটাই একটা কৃত্রিম বাষ্প, গতিটাই ধর্ম। ছাড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। পথই সত্য—কিন্তু পথ এগিয়ে গিয়েছে, এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এগিয়ে চলার অর্থ কি সব পিছনে ফেলে যাওয়া? তাহলে, ঐতিহ্যই বা কী বৌদ্ধশাস্ত্রই বা কেন? প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণেরই বা প্রয়োজন কোথায়? পিছনে পড়ে গেলেই যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কেদারনাথ পাণ্ডে কেন পঞ্চাশ বৎসরের ওপার থেকে রাহুলজীর চেতনায় জেগে উঠতে পারেন? গতির সঙ্গে গতের এই মেলবন্ধনও জীবনেরই আর এক নিগূঢ় নিয়ম।

রাহুলজী যখন নেই, তখনো যে মহাপথিক রাহুলজী সকল পথিকের সহযাত্রী রূপেই থেকে গিয়েছেন, এ কথাও তাই আজ সত্য বলেই অনুভব করছি।

উত্তীর্ণ গোধূলি ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য

কুয়াশার সাদা পশমে মুখ ঢেকেছে শীতের সন্ধ্যা!
দূরের পথ দৃষ্টিসীমার বাইরে।
উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার তমিস্রাভেদী আলো জ্বালিয়ে
পথ চেয়ে আছি—
কখন অন্ধকার নড়ে উঠবে,
ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে একটি ক্লান্ত করুণ মূর্তি,
আসবে তুমি॥

কবি বলেছেন।
'আমার গোধূলি-লগন এলো বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে,
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে
সোনার গগন রে।'—
আমাদের গোধূলি লগ্ন
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে না।
সারাদিনের প্রাণান্ত পরিশ্রমে
সারাদেহের রক্ত উঠে আসে মুখে—
ওরি নাম সূর্যাস্ত॥

আকাশে শুক্লা সপ্তমীর শশিকলা,
তারার চুমকি-দেওয়া ইস্পাত-নীল ওড়নায়
মুখের আধখানি ঢাকা।
মর্ত্যলোকে সহস্র দীপ
অন্ধকার-সমুদ্রে ভাসমান।
এই তো তোমার ঘরে ফেরার লগ্ন॥

তুমি আর আমি জন্ম দিয়েছিলুম
একটি সন্তানকে—
একটি দেবশিশু,
ইহলোকে তার নাম প্রেম।
তাকেই লালন করব বলে
দুজনে মিলে গড়েছি একটি নীড়।
সে নীড়ের বুকে লেগেছে কালের অভিশাপ।
মর্ত্যের উনপঞ্চাশ পবনে তা ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে,
জড়শক্তির দাপটে ভেঙে পড়তে চায়॥

হায়রে বিংশ শতাব্দীর স্বল্পবিত্ত মহানাগরিক!
একলা পুরুষের উপার্জনে
জমাখরচের হিসেব আজ তিনশূন্যে এসে বেসামাল।
তাই
নারীকে বেরিয়ে আসতে হয়
জীবিকার অন্বেষণে,
শুদ্ধান্তঃপুর থেকে
নামতে হয়
মেহনতী জনতার ভিড়ে॥

আজকের মতো আমার দিনগত পাপক্ষয় শেষ হয়েছে।
তোমার হয় নি।
তাই
ঘরে ফিরে এসে তাকিয়ে আছি পথের দিকে—
কখন অন্ধকার নড়ে উঠবে,
ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে একটি ক্লান্ত করুণ মূর্তি,
আসবে তুমি॥

একদিন তোমার মধ্যে চেয়েছি নারীকে,
আজ তোমাকেই চাই।
আমার জীবনযুদ্ধের অংশভাগিনী,
আমার আত্মার দোসর॥

অকাল বৃষ্টি ॥ মণিভূষণ ভট্টাচার্য

অকালমৃত্যুর দেশ। চৈত্রের পনেরো। বৃষ্টি নামে।

প্রথমে বাতাস, ঠাণ্ডা বাতাসে ধুলোর জমিদারি
রপ্ত হয়। ফুসফুসে মগজে হাড়ের অন্তঃপুরে
ধুলো জমে। টুপ টাপ, দাতব্য বর্ষণ চালু হয়,
ধুলো কমে, সোঁদাগন্ধ, বৃক্ষে পশুপাখির সংসারে
রসের পিপাসা জাগে ; তৃষ্ণায় রচিত মানুষের
নিদ্রায় বা জাগরণে চিরস্থায়ী জলের অভাব।
কারণ জলের ঋণ র'য়ে গেলো, বিশুদ্ধ জলের···।

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো রক্ত সচকিত হয়।
বাতাস কোমল ক্ষিপ্র সমজদার আদুরে, অথচ
আড়াই ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় লীলা ধূলিসাৎ।
চকচকে পিচপথে আলোর সোহাগ ঢলে পড়ে,
তৎসহ বৃষ্টির শব্দ আজগুবী পায়ের শব্দের
যুগপৎ আলোড়ন হৃদয়কে কবজা করে রাখে।

অকালবৃদ্ধের দেশে রীতিনীতিবোধের আকাল
ঘটে না। অভাব শুধু বৃষ্টির, জলের, যুবকের।
ধুলোর কমতি নেই, রক্তের উৎকোচে সাময়িক
পিপাসার চেয়ে তীব্র জলসত্রে আচমন, আর
বৃষ্টিহীন ভূমিহীন ধর্মহীন অভ্যাসে সহসা

হঠাৎ সন্ধ্যার ঝড়ে ভিতরে উৎপাত শুরু হয়।

তোমার হাতে ॥ অশোক পালিত

শিখা যদি কাঁপে
জানি তুমি আসবে
তোমার হাত জ্যোৎস্নায় অভয়
শান্তির মতো।

মানুষের এত কাছে থেকেও
মৃত্যুভয়ে কাঁপি
লজ্জা নেই সজ্জা নেই
রক্তের স্বাদ পেয়ে জানোয়ার।

মানুষের বেদনায় দীর্ণ হতে গিয়ে ভয়ে
পালিয়ে এসেছি
তারপর থেকে প্রতিদিন প্রতিরাত
কষ বেয়ে রক্ত পড়ে
দাঁতে দাঁত চেপে গুহায় চোখ জেলে রাখি।
আর আমার নাগালের বাইরে
আমার নিরবলম্ব আত্মা
শূন্যে
তোমার হাতটি খুঁজে বেড়ায়
জ্যোৎস্নায়।

গুণিন ॥ দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

গুণিনকে বলো, ওহে ফুল্ল বৃক্ষ ভীষণ আহত।

অতঃপর সেই অন্তরঙ্গতার বিপুল উপমা
পপাত ধরণীতলে।
সহসা কে রাখে হাতে গূঢ়তম ব্যাধি!

বৃক্ষের চরিত্রে তবু অন্য এক দাবি ছিল:
প্রবল ঋজুতা।
যেহেতু উঠন্তি বৃক্ষ অঙ্কুরোদ্গমে
প্রমাণিত।
একদা কে উত্তরাধিকারী এলে অনভিনিবেশে
ইদানিং ফুল্ল বৃক্ষ ভীষণ আহত।

বরঞ্চ গুণিনকে তুমি ডেকে দিয়ে যেও।

সাগরের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে… ॥ তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগরের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে অতলে তলিয়ে তিমিরে যাব,
দামাল-ক্রুদ্ধ কামনাগুলোকে লাথি মেরে মেরে গুঁড়িয়ে ফেনায়—
উথাল-পাথাল বুক চাপড়িয়ে যদি সমুদ্র হাঁক-ডাক ছাড়ে
ঝুঁটি ধরে তার দুহাতে জড়িয়ে চোখ-কান বুঁজে পাতালে যাব
তটে বিভীষিকা ঝাপটে সজোরে রসিকতা করে আছড়ে মারে—
তলায় তলিয়ে রসাতল ঘুরে চিল্লিয়ে জোর তোমাকে চেনায়
সাগরের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে হিরণ্য-ঢেউয়ে হারিয়ে যাব!

যেখানেই হোক পাহাড়ে-চূড়ায় দ্যুলোকে ভূলোকে শ্বাপদ-গুহায়
যেখানেই রাখো কিংখাবে মুড়ে কড়ির পাহাড়ে গোপন-কোঠায়
কিংবা তোমরা প্রাণটাকে যদি কুলুপ আটকে আড়ালে ভাবো
খুঁজেই পাব না, ঠিক টেনে এনে দুহাতে পিষিয়ে বাহুতে তোমার
ছুটে দুমদাম্ বেপরোয়া হয়ে তোমাকে ঝুলিয়ে প্রলয়ে যাব,
স্বর্গ-মর্ত্য-গ্রহ-তারা আদি রসাতল চুঁড়ে ঘুচিয়ে ত্রিকাল,
বুক চিরে চিরে পাক খেতে খেতে চোরাবালি ভেঙে আনবো ডাঙায়॥

র‍্যামফোরিংকাস

অমল দাশগুপ্ত

অনেক দরখাস্ত লিখে, অনেক তদ্বির করে, অনেকদিন অপেক্ষা করার পরে একটি যুবক একটি চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছিল। আশা ছিল যে চাকরিটা সে-ই পাবে। এই আশা পোষণ করার সবচেয়ে বড়ো কারণ অবশ্যই এই যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মস্ত একটি অসহায় পরিবার দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাওয়ার রমনীয় জীবনের দিন গুণছিল। এ-অবস্থায় স্বভাবতই দায়িত্বপালনের অক্ষমতায় পীড়িত মন বড়ো রকমের একটি আশায় বুক বাঁধতে অনুদগ্রীব ছিল না। কিন্তু ইন্টারভিউ থেকে সে ফিরে এসেছিল হতাশ হয়ে নয়, দিব্যদৃষ্টি লাভ করার মতো সম্মোহিত মুগ্ধতায়, উদ্ভট একটি শব্দ বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে করতে। বাড়ির লোকেরা তার অবস্থা দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিড়বিড় বকুনির মধ্যে থেকে পুরো শব্দটি উদ্ধার করার পরে সকলেই হতভম্ব। শব্দটি 'র‍্যামফোরিংকাস'। অনেক প্রশ্ন করার পরে যুবকটির মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল যে ইন্টারভিউয়ে এই শব্দটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে যুবকটির সাধারণ জ্ঞান যাচাই করা হয়েছে। খবরের কাগজ পড়া একালের যুবক অবশ্যই দমবার পাত্র নয়। শুধু অনুস্বারের ওপরে ভরসা রেখেই র‍্যামফোরিংকাসকে বানিয়ে এসেছে চীনা মুগুর। পরে অবশ্যই তাকে জানতে হয়েছে—র‍্যামফোরিংকাস আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগের পৌরাণিক কালের একটি জীব। পাখি নয় সরীসৃপ। আকারে পায়রার চেয়েও ছোট, চেহারায় অনেকটা একালের বাদুড়ের মতো। পাখি নয়, তবুও ডানা আছে। ডানা আছে তবুও পাখির মতো উড়তে পারে না। সর্বোপরি আছে দু-সারি ধারালো দাঁত। এই জীবটির সঙ্গে চীনাদের কোনো সম্পর্ক নেই জানার পর থেকেই যুবকটির সম্মোহিত অবস্থা।

তারপর একদিন সে নানা মানুষের মুখে মুখে প্রশংসা শুনে মস্ত একটি জলসায় গিয়েছিল গান শুনতে। গিয়ে দেখল, জলসা মস্তই বটে, গানের আয়োজনও নিখুঁত, কিন্তু আসর জাঁকিয়ে বসে আছে, কি আশ্চর্য, একদল

র‍্যাম্‌ফোরিংকাস! এই দৃশ্য দেখে তার আত্মবিস্মৃতি ঘটল। দৃশ্যগুলো তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে লাগল স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখার মতো।

সভাপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করলেন: 'আজ আমাদের বড়ো আনন্দের দিন। আমরা ছিলাম বাদুড়, হয়েছি র‍্যামফোরিংকাস। যারা বলেছিল র‍্যাম্‌ফোরিংকাসের দিন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, এবার তাদের জিভ উপড়ে নিলেই উচিত শিক্ষা হবে। আসুন, সভার কাজ শুরু করার আগে আমরা র‍্যাম্‌ফোরিংকাসের জয়ধ্বনি দিই।'

এই বলে সভাপতি শ্লোগান দিলেন, 'র‍্যাম্‌ফোরিংকাস—'

সমাবেশে সাড়া জাগল: 'জিন্দাবাদ!'

এই র‍্যামফোরিংকাসের দলে একজন ছিলেন যাঁকে দেখেই ধাড়ী বলে মনে হচ্ছিল। তিনি বসেছিলেন ঠোঁট দুটোকে ফাঁক করে দু-পাটি দাঁতের ধারালো ঝিলিক তুলে। অন্যরা যখন শ্লোগান দিচ্ছিল তখনো তিনি একবারও ঠোঁট বন্ধ করেন নি। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল যে শ্লোগান দেওয়ার দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে তিনি অসম্মত। আর খুব সম্ভবত এই অসম্মতিটাকে প্রকট করবার জন্যেই তাঁর এই ঠোঁটভঙ্গিমা।

শ্লোগান শেষ হবার পরে ধাড়ী মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বিপুল পক্ষবিধুনন শোনা যেতে লাগল। আর তাই শুনে ধাড়ী মহাশয় উৎফুল্ল হওয়া দূরে থাকুক, কি কারণে যেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। চোখ পাকিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে হুংকার ছাড়লেন: 'থাম!'

ধাড়ী মহাশয়ের হুংকার বজ্রপাতের মতো নেমে আসতে সকলেই বুঝতে পারল, কোথাও একটা বড়ো রকমের অন্যায় হয়ে গিয়েছে। তখন সকলেই এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ধাড়ী মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত পাবার জন্যে বিপন্ন সভাপতি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু ধাড়ী মহাশয়ের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সমানে চোখ পাকাচ্ছেন আর ডানা ঝাপটাচ্ছেন।

আর তখন ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হল সভাপতির কাছে। তিনি তখন সমাবেশকে লক্ষ্য করে আবেগকম্পিত স্বরে বলতে লাগলেন: 'ভাই সব, আজ আমাদের বড়ো আনন্দের দিন। আমরা ছিলাম বাদুড়, হয়েছি র‍্যাম্‌ফোরিংকাস।

কিন্তু বাদুড়-জীবনের কতকগুলো কু-অভ্যেস এখনো আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে। তাই আমরা আনন্দ প্রকাশ করার জন্যে জয়ধ্বনি দিয়েছি। আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে। আমরা ভুলে গিয়েছি যে আমরা র‍্যাম্‌ফোরিংকাস। আমাদের আনন্দপ্রকাশের ধরনও হবে র‍্যাম্‌ফোরিংকাস-ঐতিহ্যের অনুসারী। আমাদের মহান নেতা ধাড়ী মহাশয়কে আপনারা লক্ষ্য করুন। এই হচ্ছে সনাতন র‍্যাম্‌ফোরিংকাসীয় রীতি। আমাদের সৌভাগ্য যে ধাড়ী মহাশয়কে আমরা নেতা হিসেবে পেয়েছি। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলব।'

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বিপুল পক্ষ-বিধুনন। পরক্ষণে প্রত্যেকটি র‍্যাম্‌ফোরিংকাস ধাড়ী মহাশয়ের অনুকরণে ডানা ঝাপটাতে ও চোখ পাকাতে লাগল।

আর তাই দেখে ধাড়ী মহাশয় আচমকা শূন্যে লাফ দিলেন। কিন্তু র‍্যামফোরিংকাসের ডানায় এমন ক্ষমতা থাকা উচিত নয় যে মাটি থেকে শূন্যে উড্ডীয়মান হওয়া সম্ভব। শূন্যে যদি কোনো অবলম্বন পাওয়া যেত তাহলে ডানার নখরযুক্ত তিনটি বাড়তি আঙুলের সাহায্যে তা আঁকড়ে ধরতে পারতেন। কিন্তু সেই অবলম্বনটুকুও না থাকাতে তিনি নিজেকে ধপাস করে মাটিতে পড়তে দিলেন।

আর তাই দেখে সভাপতি আরো উল্লসিত হয়ে উঠলেন যেন। চোখ পাকাতে পাকাতে আর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনারা দেখুন, ভালো করে দেখুন। দেখে শিখুন, আরো বেশি করে শিখুন। ধাড়ী মহাশয় আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, শুধু চোখ পাকালে আর ডানা ঝাপটালে র‍্যাম্‌ফোরিংকাসের আনন্দ প্রকাশ শেষ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে ঝাঁপ দিতে হবে। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, ধাড়ী মহাশয়ের দৃষ্টান্ত আপনারাও অনুসরণ করুন।'

তখন প্রত্যেকটি র‍্যাম্‌ফোরিংকাস এক-একবার শূন্যে ঝাঁপ দিতে লাগল আর পরক্ষণেই ধপাস করে মাটিতে পড়তে লাগল।

ওদিকে ধাড়ী মহাশয় ততক্ষণে ডানা ঝেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দলশুদ্ধ সবাই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছে আর মাটিতে ধপাস ধপাস করে পড়ছে—এ দৃশ্য দেখে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন।

তখন যথারীতি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, দৃশ্য পরিবর্তিত হল। দেখা গেল, প্রত্যেকটি র‍্যাম্‌ফোরিংকাস তাঁরই মতো ডানা ঝেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করছে।

তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যথারীতি তাঁকে অনুকরণ করে গোটা সমাবেশটিও স্তব্ধ হল। তখন তিনি বলতে লাগলেন: 'তোমরা বলছ, র‍্যাম্‌ফোরিংকাসের দলে আসতে পেরে তোমাদের নাকি খুবই আনন্দ হয়েছে। এতজনকে দলে পেয়ে আমার নিজেরও খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই দুঃখের সঙ্গে আমাকে উপলব্ধি করতে হল যে তোমরা এখনো মনেপ্রাণে র‍্যাম্‌ফোরিংকাস হতে পারো নি। তোমাদের শরীরে এখনো সেই স্তন্যপায়ীদের মতো উষ্ণ রক্তই থেকে গিয়েছে। সেই বিশ্রী রকমের উষ্ণ রক্ত। সরীসৃপের শীতল রক্তের স্তরে উত্তীর্ণ হতে তোমাদের এখনো বহু দেরি।'

ধাড়ী মহাশয় একবার থামতেই সভাপতি সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, বহু দেরি।'

অন্যরাও যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। তারাও সমস্বরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, বহু দেরি।'

ধাড়ী মহাশয় এবারে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। উষ্ণ রক্তের জীব স্তন্যপায়ীদের মতোই ফেটে পড়লেন একেবারে: 'তোমরা চুপ করবে কিনা!'

সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি বলে উঠলেন, 'চুপ, চুপ।' অন্যরাও সায় জানাল, 'চুপ, চুপ।'

তখন উরঃফলকের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মাংসপেশীকে ফুলিয়ে তুলে ধাড়ী মহাশয় বলতে লাগলেন, 'আমি যতই তোমাদের দেখছি ততই হতাশ হচ্ছি। যে মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আমরা র‍্যাম্‌ফোরিংকাস হতে চেয়েছিলাম, তোমরা তার উপযুক্ত নও। তোমরা এখনো স্তন্যপায়ীদের ঘৃণিত জীবনকেই আঁকড়ে ধরে আছ। র‍্যামফোরিংকাসের মতো উচ্চমার্গের সরীসৃপ হতে হলে জীবন সম্পর্কে যে অন্যতর উপলব্ধি থাকা দরকার তা তোমাদের অনায়ত্ত। তোমাদের যতই দেখছি, আমার সেই ঘৃণিত বাদুড়জীবনের কথাই মনে পড়ছে। কথাটা তোমাদের আগেও অনেকবার বলেছি, আবারও বলছি। কোনো জীব যখন নিজেকে ছাড়িয়ে পাঁচজনের সঙ্গে জোট বাঁধতে চায়, নিজের

কথাকে পাঁচজনের কথা করে তোলবার চেষ্টা করে, পাঁচজনের চলার সঙ্গে নিজের পা মেলাতে যায়—তখন বুঝতে হবে জীবটি তার মগজের দাস হয়ে পড়েছে। জীবন হচ্ছে দাসত্বের বিপরীত—সর্বৈব স্বাধীন। স্তন্যপায়ীদের জীবনকে আমরা ধিক্কার জানাই কারণ স্তন্যপায়ীরা মগজের দাস—তাদের গোটা জীবনটাই দাসত্ব। তারা কোনো সময়ে শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না। এই কারণে শুধু নিজের ভাবনাকেই একমাত্র ভাবনা বলে জাহির করার ক্ষমতাও তারা হারিয়েছে। তাই আমরা সরীসৃপের জীবনকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি। সরীসৃপের মগজ না-থাকার মতো—তাই মগজের দাসত্ব করার কোনো প্রশ্ন নেই। স্বাধীন জীবন বলতে আমরা যা বুঝি তা একমাত্র এই সরীসৃপদের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। সরীসৃপ একা, সরীসৃপ মগজহীন, সরীসৃপ স্বাধীন। আবার এই শ্রেষ্ঠ জীব সরীসৃপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে র‍্যাম্‌ফোরিংকাস। শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে এই জীবটি না জমির, না আকাশের, না জলের। কোনো বিশেষ এলাকার নয় বলেই নিখিল বিশ্বের। এই জীবটির দুটি পা আছে কিন্তু তা এমন শক্ত নয় যে তার সাহায্যে জমির ওপরে ছুটোছুটি করা যায়। দুটি ডানা আছে কিন্তু তা এমন পোক্ত নয় যে তার সাহায্যে খুশিমতো আকাশে ওড়া চলে। অন্যদিকে শরীরের হাড়গুলো সবই ফাঁপা—তাই জলের মধ্যে পড়লেও ডুবে যাবার ভয় নেই। অর্থাৎ, বিশেষ কোনো এলাকার নয়, অথচ সর্ব এলাকার। বিশেষভাবে কিছুই নেই অথচ সাধারণভাবে সব কিছুই আছে। সর্বদায়িত্বমুক্ত, সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বতোভাবে স্বাধীন এই জীবটিকেই তাই আমরা আমাদের আদর্শ করেছি। আমরা তাই চেয়েছি র‍্যাম্‌ফোরিংকাস হতে। কথাগুলো তোমাদের আগেও বলেছি, আবারও বলছি। তোমরা বুঝতে পারছ তো?'

সবাই সমস্বরে সায় জানাল, 'হ্যাঁ।'

তাই শুনে স্তন্যপায়ী জীবের মতোই খুশি হয়ে উঠে ধাড়ী মহাশয় বলতে লাগলেন, 'অন্যরা আমাদের কথা শুনে ঠাট্টা করে বলেছিল, র‍্যাম্‌ফোরিংকাসরা নাকি পৃথিবী থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগে লোপ পেয়েছে আর এই চোদ্দ কোটি বছর ধরে জীবনের উন্নতির ফলই নাকি স্তন্যপায়ী জীব! আমরা ওদের ঠাট্টা গায়ে মাখিনি, কারণ আমরা জানতাম যে মগজওলা জীবরা সবসময়ে শেখানো কথাই বলে থাকে। উন্নতি! জীবনের যেন সত্যি-সত্যিই উন্নতি-অবনতি বলে কিছু আছে! যেন একটা সিঁড়ি—জীবন সেই

সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে হয়ে উঁচুতে উঠছে! একমাত্র আমরাই বুঝতে পেরেছিলাম যে জীবন হচ্ছে অনেকটা আগুনের শিখার মতো। তার অস্তিত্ব ও মাধুর্যের জন্যেই সমস্ত রকমের বন্ধন থেকে মুক্তি চাই। আগুন যেখানে জ্বলে, যা তার উৎস, সেখানে উৎসের সঙ্গে আবদ্ধ থাকার জন্যেই আগুন কখনো শিখা হতে পারে না। অথচ আগুন যেখানে মুক্ত সেখানেই অতি অপরূপ শিখা। আমরা এই মুক্তির সন্ধানেই চোদ্দ কোটি বছর পিছিয়ে এসে র‍্যাম্‌ফোরিংকাস হয়েছি। জীবনটা আমাদের কাছে সিঁড়ির ধাপ নয় যে একবার উঁচুতে উঠলে আর পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। জীবন আমাদের কাছে মুক্তির উল্লাসে উল্লসিত আগুনের শিখা। এমন কি কালের বন্ধনও আমরা স্বীকার করি না। আমরা একালেরও হতে পারি, সেকালেরও হতে পারি, নেই-কালেরও হতে পারি। এই স্বাধীনতাই আমাদের কাছে জীবন। এই স্বাধীনতার গৌরবেই আমরা স্বতন্ত্র, আমরা একা, আমরা নির্বিশেষ। কথাগুলো তোমাদের আগেও বলেছি, আবারও বলছি। তোমরা বুঝতে পারছ তো?'

সবাই সমস্বরে সায় জানাল, 'হ্যাঁ।'

ধাড়ী মহাশয় বলে চললেন, 'কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি বুঝতে পারছি, স্বাতন্ত্র্যবোধ তোমাদের মধ্যে এখনো আসেনি। তোমাদের মধ্যে এখনো স্তন্যপায়ীদের মতো জোট বাঁধবার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তোমরা জয়ধ্বনি করলে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলে। তার মানে, তোমাদের স্বাতন্ত্র্য আর রইল না, একে অপরের মতো হবার চেষ্টা করতে গিয়ে দাসত্বকে স্বীকার করে নিলে। তোমরা যদি সত্যিই র‍্যাম্‌ফোরিংকাস হতে চাও তাহলে কোনো প্রকারের দাসত্বকে স্বীকার করা চলবে না। সব সময়ে মনে রাখবে, তুমি একা, তুমি স্বতন্ত্র, তুমি কারও নও, তুমি একমাত্র তোমার নিজের। বুঝতে পারলে?'

সবাই সমস্বরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

আর ঠিক এমনি সময়ে যুবকটি শব্দ করে হাই তুলল। সঙ্গে সঙ্গে ধাড়ী মহাশয় সমেত পুরো দলটি উড়তে শুরু করল ঝাঁক বেঁধে। প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে পড়ে রইল কিছু নকল সাজগোজের উপকরণ। আর তখন বোঝা গেল, জীবগুলো আসলে যা ছিল তাই। একদল বাদুড়। তারপরে সেই জীবগুলো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে একখণ্ড অন্ধকারকে ব্যাকুলভাবে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

যুবকটি আবার পরদিন থেকেই চাকরির জন্যে নতুন করে দরখাস্ত দিতে শুরু করেছিল।

সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা : ভিন্ন চিন্তা

গৌতম সান্যাল

'পরিচয়'-এর বৈশাখ (১৩৭০) সংখ্যায় অধ্যাপক সতীন্দ্র চক্রবর্তী "সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। দীর্ঘ প্রবন্ধটি অসংখ্য উক্তির সংকলনে ভারাক্রান্ত হয়ে লেখকের মূল বক্তব্যকে অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট করে তুলেছে। এর সঙ্গে "পার্টি-নায়কতন্ত্রের উদ্ধত অশালীনতা কতখানি প্রগলভ হতে পারে" তার নিদর্শন দেখাতে গিয়ে সংকলিত উক্তির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে প্রবন্ধকারের যথেচ্ছ বাঁকা হরফের ব্যবহার আরও বিভ্রান্তিকর। প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্যগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়: (১) শিল্পের আলোচনা রাজনীতির অধিকারের বাইরে। (২) 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র স্বরূপ হলো হাস্যকর। "শিল্পে-সাহিত্যে শিল্প-সাহিত্য সুষমা, মনোহারিত্বই প্রধান কথা।" শুভ ইচ্ছা বা মতাদর্শের প্রশ্ন গৌণ। (৩) সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের দাবি "শিল্পী স্বাধীনতা পাবেন না, পুরাতনের পাষাণভার বয়ে শিল্পী-সাহিত্যিককে চলতে হবে, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা', 'পার্টিজান্‌সিপ-নীতি', 'জনসাযুয্য' প্রভৃতি প্রত্যয়ের কঠিন বন্ধনে সমাজতন্ত্রের বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করতে হবে। (৪) "বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা এসে মেশে, সেই ধারায় লেবেল-আঁটা 'বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি' বিশুদ্ধ আর্টের মতোই একেবারেই মিথ্যা, প্রপ্যাগাণ্ডার জগতে ছাড়া যার অস্তিত্ব নেই। (৫) "কমিউনিজম যখন পূর্ণতালাভ করবে তখনও ব্যক্তি নির্বাধ স্বাধীনতা পাবে না।"—এই উক্তি সমাজতন্ত্রে বিকৃতাবস্থা প্রমাণ করে।

(১) শিল্পের বিচার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্ভব। শুদ্ধ শিল্পরূপের বিচার অমিশ্র নান্দনিক মূল্যবোধ দ্বারাই কাম্য। কিন্তু শিল্পকে যদি আমরা জীবনের অপ্রয়োজনীয় অংশরূপে না ভাবি—তবে তার মূল্যায়ন ব্যাপকতর পরিধির

পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া কেবলমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—তার গুরুত্ব অধিকতর। রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী আপাতদৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু সকলক্ষেত্রে একথা খাটে না। যে সমাজে এক নতুন মূল্যবোধের বাস্তব রূপায়ণের প্রচেষ্টা চলছে—স্বাভাবিকভাবেই সেই সমাজের রাজনৈতিক চিন্তাধারা—অন্যান্য ভাবাদর্শগত বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ভাবাদর্শের বিকাশ বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব; এবং প্রত্যেকটি উপায়ই আমাদের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধকে কিয়দংশে আচ্ছন্ন করে। কাজেই শ্রীইলিচভ যখন বিশেষ শিল্প বা সাহিত্যকে সোভিয়েত বিরোধী ও মানববিদ্বেষী বলে অভিহিত করেন—তখন তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে বৃহত্তর মূল্যবোধাশ্রিত চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার বিষয় হবে উক্ত বৃহত্তর মূল্যবোধটি। সেটিকে গ্রহণ করব না বর্জন করব সে প্রসঙ্গ অন্য। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের বিচার্য বিষয় কেবলমাত্র তার শিল্প-সাহিত্য সুষমা বা মনোহারিত্ব নয়—একথাকে অস্বীকার করা নিতান্তই চিন্তার সঙ্কীর্ণতা ও দৈন্যের পরিচায়ক হবে।

(২) এই সূত্র ধরেই আমরা প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারি। ভার্দোভস্কির উক্তি সংকলিত করে অধ্যাপক চক্রবর্তী 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র তাত্ত্বিক রূপটি উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন—এতে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র নিহিতার্থকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা আছে বলে ভাবা অসঙ্গত হবে না। তবে এ প্রচেষ্টা অবশ্য ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতাজনিত যে-কোনও কারণেই হতে পারে। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' কখনই শিল্প-সাহিত্য সুষমাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার কথা বলে না। শিল্প-সাহিত্য সুষমা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী যদি নন্দনতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্প-সাহিত্য সুষমার স্বরূপ নির্ণয় করার পর 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র সমালোচনায় প্রয়াসী হতেন—তবে তার বক্তব্যকে কিছুটা অশালীন প্রগলভতার প্রশ্রয়মুক্ত করতে পারতেন।

(৩) অধ্যাপক চক্রবর্তীর বক্তব্যের তৃতীয় অংশটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। 'পরিচয়'-এর সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠা সংখ্যার কথা মনে রেখে সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক কথাগুলি উপস্থাপিত করছি। প্রথম কথা শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টি কোনো সময়েই প্রত্যয়মুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। তবে এ প্রত্যয়গুলি যদি শিল্পীর অন্তর থেকে উৎসারিত না

হয়—এগুলি যদি বাইরে থেকে শিল্পীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়—তবে সে প্রত্যয়ের প্রকাশরূপ শিল্পসৃষ্টির শিল্পমূল্য ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, যে-কোনো প্রত্যয়ের অনুবর্তী হওয়ার মানে এই নয় যে সেই প্রত্যয়টি বাইরে থেকে চাপান। প্রত্যয়গুলির নিহিত মর্ম উপলব্ধি করে সেগুলিকে শিল্পী তাঁর অন্তর থেকে পুনরায় প্রকাশ করতে পারেন—সেগুলিকে শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত করে। এতে শিল্পীর স্বাধীনতা যায় না। কঠিন প্রত্যয়গুলিকে বুকের ওপর চাপানো পাষাণভার বলে মনে হয় না ; চারিদিকের নরম পিছল কাদাজমির ওপর শক্ত পাষাণখণ্ড বলে মনে হয়—যাকে আশ্রয় করে স্থির বিশ্বাসে নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কথাগুলি যত সহজে বলা হলো—ততো সহজে হয়ত মানানো যাবে না—কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য এবং তত্ত্বের ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে করা হলো না। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা', 'পার্টিজান্‌সিপ-নীতি', 'জনসাযুজ্য' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলির তাৎপর্য গভীর। এর তাৎপর্য যথার্থভাবে বুঝতে গেলে এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে—মার্কসীয় দর্শন এবং সাহিত্যের ব্যাপকতর পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে। এগুলি ময়নার বাঁধা বুলি নয়—এবং বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করলে এই শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে সহজেই ভ্রান্তধারণা উৎপন্ন হতে পারে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতন বিদগ্ধজন এই সামান্য "Idols of the market place"-এর কবলে পড়বেন—এটা আশঙ্কা করিনি। কথাগুলির সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে তিনি দেখতে পেতেন এই প্রত্যয়ের কঠিন বন্ধনে সংবদ্ধ হলেও শিল্প-সাহিত্যের বীণা কখনই দীনহীন একতারায় পরিণত হয় না। নিছক স্বরগ্রাম আর বৈচিত্র্যই যদি কাম্য হয় তবে বীণা কেন—মত্তলোকের অট্টরোল আর জনযূথের অসংযত কোলাহলই তো শ্রেষ্ঠ সুরযন্ত্র হতো।

(৪) "বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা এসে মেশে, সেই ধারায় লেবেল-আঁটা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি 'বিশুদ্ধ আর্যের মতোই একেবারে মিথ্যা, প্রপ্যাগাণ্ডার জগতে ছাড়া যার অস্তিত্ব নেই।" বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা যুগপৎ প্রবহমান। কিন্তু সেগুলি বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এসে মিশে যাচ্ছে—একথার কোন্ অর্থ আমরা বুঝবো? বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারাগুলিতে কি তাদের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না? এতটা ভাবা বোধহয় সঙ্গত হবে না। এক অর্থে সংস্কৃতির

সকল ধারাই "লেবেল-আঁটা" এবং "বিশুদ্ধ"। তা বলে জগতে সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র প্রোপাগাণ্ডাই নেই। যে বৃহত্তর ভাবাদর্শ শিল্পীর সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে—শিল্প-সৃষ্টির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ তারই একটি অংশ—অথবা বিশেষ প্রকাশ। কাজেই শিল্পী যখন এই বৃহত্তর ভাবাদর্শ সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিল্পসৃষ্টিতে প্রয়াস পান—তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে এই ভাবাদর্শকে আরও অনেক লোকের মনে পৌছে দিতে পারেন অথবা যাদের মনে এই ভাবাদর্শ অস্পষ্টরূপে আছে তাকে স্পষ্টতর করতে পারেন। একে প্রোপাগাণ্ডা বলা যায় না। অথবা, শিল্পের শুদ্ধরূপ এতে ক্ষুণ্ণ হয় না। ক্রুশ্চভ যখন সোভিয়েত জনসাধারণের পক্ষে ঘোষণা করেন যে আমরা সংগ্রামী বিপ্লবী শিল্প চাই—তখন তিনি সম্ভবত এই কথাই বলেন যে সোভিয়েত শিল্পীরা সচেতন হয়ে এই ভাবাদর্শকে—এই নতুন মূল্যবোধকে তাদের শিল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌছে দিন। উক্ত ভাবাদর্শে যদি তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন তবে সচেতন হয়েই তাঁরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করুন।

(৫) 'নির্বাধ স্বাধীনতা'র অর্থ কি? কোন্ অবস্থায় একে পাওয়া যায়? আলাদীনের এই আশ্চর্য প্রদীপটি পেলে সকল সমস্যার সমাধান হতো। কারণ, মুক্তবুদ্ধিদের সামনে অভাব তো এই একটা জিনিসেরই—এই 'নির্বাধ স্বাধীনতা'র। কিন্তু 'নির্বাধ স্বাধীনতা' কি আদৌ সম্ভব? পৃথিবীর কোনো দর্শন, কোনো ধর্ম, কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বই 'নির্বোধ স্বাধীনতা'র কথা বলে না। আসলে 'নির্বাধ স্বাধীনতা' সম্বন্ধে আমাদের কারোর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ মার্কস কি ভেবেছিলেন তাই বুঝে ফেলে অধ্যাপক চক্রবর্তী মার্কসবাদের ওপর 'নির্বোধ স্বাধীনতা'র বোঝা চাপানোর চেষ্টা করেছেন। 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' আর শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের উদ্গাতা মার্কস—'নির্বাধ স্বাধীনতা'র আশায় বিভোর এমন মন্তব্য করার আগে আমি অধ্যাপক চক্রবর্তীকে মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আরও একটু অধিক নিষ্ঠা পোষণ করতে বলব।

প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে অধ্যাপক চক্রবর্তী মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে আরও কিছু বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—"সত্যিই বিস্মিত হই যখন দেখি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা সহাবস্থানের অনিবার্যতায় বিশ্বাসী, তাঁরাই স্বদেশে এক পাথুরে একতার জয়ধ্বনিতে মুখর। এর ফলে

সহাবস্থান-নীতির নৈতিক-মানবিক গুরুত্বের যে হানি হয়, কৌশল ছাড়া যে এ নীতির কোনও সার্থকথা চোখে পড়ে না, কুশলী রাজনৈতিকদের ঐ সহজ সত্যটা বোঝা উচিত।" এই ধরনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল এইটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে 'সহঅবস্থান নীতি'কে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে দেখার মধ্যে নিন্দনীয় কোনো কিছুই নেই। 'সহঅবস্থান নীতি' বলতেই ভাবে গদগদ হয়ে গ্যাসে ভর্তি একটা ফাঁপা বেলুনের দিকে দুহাত তুলে নৃত্য করতে হবে—তবেই তার নৈতিক-মানবিক গুরুত্ব বজায় থাকবে এমন কোনো কথাই নেই। ভারতবর্ষের জোট-বহির্ভূত থাকার পররাষ্ট্র নীতিও তো রাজনৈতিক কৌশল—তাই বলে এর কোনো নৈতিক-মানবিক গুরুত্ব নেই এমন কথা ভাবা মোটেই সঙ্গত হবে না।

পুস্তক পরিচয়

Economic History of Bengal (Volume II), নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।

ডাঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ অষ্টাদশ শতকের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের দুরূহ কাজে নিবিষ্ট। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড ঐতিহাসিক মহলে সুপরিচিত। গবেষণার যে উচ্চ মান প্রথম খণ্ডে প্রতিভাত, দ্বিতীয় খণ্ডে তা অক্ষুণ্ণ আছে। অসাধারণ ধৈর্য এবং অধ্যবসায় নিয়ে ডাঃ সিংহ উপাদান সংগ্রহ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের সেক্রেটারিয়েট রেকর্ড অফিস, ন্যাশানাল আরকাইভস, ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত পুরানো দলিল-দস্তাবেজ থেকে। অষ্টাদশ শতকে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা এবং কৃষি সম্পর্কের বিষয় জানতে এতকাল আমাদের প্রধান আশ্রয় ছিল প্রসিদ্ধ "ফিপথ রিপোর্ট", এবং কোলব্রুক ও বুকাননের লেখা ; পুরানো দলিল-দস্তাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এই প্রচেষ্টা এবং পদ্ধতি ঐতিহাসিক গবেষণার মান উন্নত করতে এবং পাঠকের মনে সমগ্র যুগ সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপলব্ধি জাগাতে সহায়ক। এই প্রসঙ্গেই তথ্যের নির্বাচন এবং বিশ্লেষণের বিষয়টি এসে পড়ে। আলোচ্য বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য তথ্যের বিশ্লেষণ। শুধু ভূমিব্যবস্থার বিকাশের বর্ণনা নয়, কৃষি-সম্পর্কের আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়ানো আছে ; শেষ অধ্যায়ে "Rural and Urban Bengal"-এর একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা, যাকে বলে Synoptic view উপস্থিত করবার চেষ্টা হয়েছে।

মোগল যুগের ভূমি ব্যবস্থার আলোচনা দিয়ে এই বই শুরু, যদিও পলাশী থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগ ডাঃ সিংহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যতদূর জানি ইতিপূর্বে এই বিষয়ের আলোচনা করেছেন ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি (Indian Land System) এবং ডাঃ তপন রায়চৌধুরী (Bengal under Akbar and Jehangir)। মোগল যুগের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে এই তিনজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য মূলত এক। মোগল যুগেই বাংলায় গড়ে উঠেছিল জমিদারি এবং তালুকদারি প্রথা, প্রাচীন গ্রাম-ব্যবস্থা (ভিলেজ কমিউনিটি)

তখন ভেঙে পড়েছে। মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় বাংলায় ছয়টি বৃহৎ জমিদারি ছিল রাজসাহী, বর্ধমান, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম এবং বিষ্ণুপুর; ঢাকা, হুগলী, সিলেট, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর এবং পূর্ণিয়ায় অসংখ্য ছোটখাট জমিদার ছিল। রেজা খাঁর বর্ণনায় সেকালের জমিদারদের উৎপত্তি ও বিভাগ পরিস্ফুট। রায়তরা জমিদারকে খাজনা দিতেন, এবং খাজনা পরিশোধ করতে পারলে তাঁদের উচ্ছেদ করা হত না। সাধারণভাবে জমি সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চয়তা বোধ ছিল। দীর্ঘকাল এক সঙ্গে গ্রামে বসবাস করবার ফলে জমিদার ও রায়তের মধ্যে স্নেহ ও পরস্পর-নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল (ডাঃ সিংহ, পৃঃ ৭, ৮, ১৭, ১৮)।

পলাশী থেকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মধ্যে এই ভূমিব্যবস্থা অনিবার্য ভাঙনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ১৭৫৭ সালে চব্বিশ পরগণার জমিদারি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। তিন বৎসর পরে বর্ধমান ও মেদিনীপুরের জমিদারি মীরকাশিম কোম্পানিকে প্রদান করেন। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি লাভ করে। ইজারাদারি প্রথা নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের পরীক্ষাকার্য (farming experiment) বাংলাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়; "নেটিভদের" কাছে এই প্রথা হিন্দুস্থানের রীতিনীতির বিরোধী এক পীড়নমূলক ব্যবস্থা বলে গণ্য হয়। ইজারাদাররা ছিল ফাটকাবাজ, এদের অত্যাচারে রায়তদের অবস্থার অবনতি ঘটে। ভারতীয় কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত পুরানো দেশীয় রাজস্ব-ব্যবস্থা লুপ্ত হয়; "রাজস্ব পরিচালনা বল্গাহীন হয়ে পড়ে।" যত শীঘ্র যত বেশী অর্থ সংগ্রহ করা যায় কোম্পানির তখন সেই চেষ্টা। এই অবস্থায় ঘটে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যার ফলে বাংলার জনগণের এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়, এবং কর্ষণাধীন জমির এক-তৃতীয়ংশ খিল পড়ে (পৃঃ ২৪, ২৫, ৪২, ৪৫, ৪৬)।

ডাঃ সিংহ একটি পৃথক অধ্যায়ে ছিয়াত্তয়ের মন্বন্তরের বর্ণনা দিয়েছেন। ১৭৭০ সালের গোটা বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলে। সাধারণ বৎসরে মোটা চালের মনপ্রতি দর যেখানে ছিল পাঁচ থেকে ছয় আনা, দুর্ভিক্ষের বৎসরে সেখানে চালের দর হয় টাকায় ছয় সাত সের। সারা দেশ জুড়ে চলে মহামারীর তাণ্ডব। শতকরা ৫ ভাগ মাত্র ভূমিরাজস্ব মাপ করা হয় না, পরের বৎসর শতকরা ১০ ভাগ ভূমিরাজস্ব বাড়ানো হয়; সরকারী ত্রাণকার্য ছিল "অমানুষিক ভাবে অপর্যাপ্ত"। কৃষকদের ব্যাপক মৃত্যুর ফলে "পাইকস্ত

রায়তদের" সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দেশে চুরি-ডাকাতির হিড়িক পড়ে; উত্তর বঙ্গ জুড়ে ঘটে ত্রিহুত, খোরুঙ্গ এবং কোচবিহার থেকে আগত সন্ন্যাসী এবং কোচবিহার থেকে আগত সন্ন্যাসী এবং ফকীরদের "বিদ্রোহ"। (ডাঃ সিংহ অবশ্য বিদ্রোহ কথাটি ব্যবহার করেন নি, তিনি "*Sannyasi* and *Fakir* raiders" কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং আরো কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ সম্পর্কে যে নতুন আলোকপাত করেছেন, এই প্রসঙ্গে অনেকের তা মনে পড়বে)। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে কোম্পানি চালু করে পাঁচ সালা ব্যবস্থা (পৃঃ ৪৯, ৫৭, ৬২, ৬৪)।

জমিদারি প্রথার স্থান অধিকার করল নতুন ইজারাদারি প্রথা। বাংলা তখন শ্মশানে পরিণত। জমিদাররা ডাক থেকে সরে দাঁড়ালেন; জমি ডেকে নিল এক নতুন ইজারাদার শ্রেণী। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন রানী ভবানী) জমিদারই জমির ইজারা নিলেন। নতুন ইজারাদার ছিলেন কোম্পানির কর্মচারী, এবং কলকাতার বানিয়াগোষ্ঠী, যথা কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মদন দত্ত, হুজুরিমল, দুর্গাচরণ মিত্র। কলকাতা থেকে অনতিদূরে হুগলী, হিজলী, মহিষাদল, তমলুক, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলের ইজারাদার ছিলেন প্রধানত কলকাতার বিত্তবান বানিয়া চক্র। ইজারাদারি প্রথায় জমির খাজনা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। ইজারাদার অবশ্য আমলনামা পেল, কিন্তু রায়ত সাধারণত পাট্টা থেকে বঞ্চিত হল। পাট্টা থেকে বঞ্চিত রায়ত সহজেই ইজারাদারের শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হন। জটিল পাট্টা সমস্যার সমাধানে সরকার ষোল আনা ব্যর্থ হলেন, যদিও এই সমস্যার সমাধানের উপরই রাজস্ব-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল (পৃঃ ৬১, ৭০, ৭২, ৭৫, ৭৮, ৮৮)।

ইজারাদারি প্রথার শোচনীয় ব্যর্থতার পরে কোম্পানি জমিদারি প্রথায় ফিরে গেল। আবার চললো নতুন পরীক্ষা, যার পরিণতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে গ্রাম-বাংলার শ্রেণী বিন্যাসের এক নতুন রূপরেখা ফুটে উঠেছিল। সামাজিক পিরামিডের শীর্ষে দণ্ডায়মান চারটি বৃহৎ জমিদারি—বর্ধমান, রাজসাহী, নদীয়া, দিনাজপুর। অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদারি অসংখ্য—যশোহর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, হিজলী, পাচেট, সুসং, রামগড় ইত্যাদি। জমিদারদের বৃহৎ জমিদারির কিছু অংশ ইজারা দেওয়া হত। কোম্পানির স্তন খেয়ে গজিয়ে ওঠে একটি নতুন জমিদার শ্রেণী—কলকাতার

বানিয়াগোষ্ঠী, যার স্বনামধন্য প্রতিনিধি কৃষ্ণকান্ত নন্দী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মহারাজা নবকৃষ্ণ। তালুকদার শ্রেণী তখন বিকাশমান; কেবল ঢাকা জেলার কয়েকটি পরগণায় চার হাজারের বেশি তালুকদার ছিল। রায়তদের মধ্যে একদল (ডাঃ সিংহের ভাষায় *Superior Ryat*) বেশ প্রভাবশালী ছিল বলে মনে হয়; গ্রামের এই "মণ্ডলগণ" অপেক্ষাকৃত কম খাজনা দিত। এদের নিচে ছিলেন *Lower Ryat* (ডাঃ সিংহের ভাষা)। রায়ত সাধারণত জমিতে দখলীস্বত্ব ভোগ করত, সম্ভবত জমি বিক্রি বা বন্ধক দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। পিরামিডের একেবারে তলায় ঠাঁই পেয়েছিল "আধিয়ার", ক্ষেতমজুর এবং "মালঙ্গী"। "আধিয়ার" খাজনা দিত ফসলে; নিজের জমি সামান্য, তাই অন্যের জমি সে চাষ করত। বুকানন দিনাজপুর জেলায় দেড় লক্ষ "আধিয়ার" দেখেছিলেন। অন্যান্য জেলায় এই শ্রেণীর সংখ্যা এতো বেশি ছিল কিনা তা বলা যায় না। পূর্ণিয়ার ক্ষেতমজুর নয় মাসের মজুরী পেত চার টাকা আট আনা এবং খোরাকী। হিজলী ও তমলুকের "মালঙ্গীরা" ছিল ভূমিদাসের সামিল। ১৭৯৪ সালে সরকার এই বর্বর প্রথা তুলে দেন (পৃঃ ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১, ১৩৩, ১৪৩, ১৪৪)। ডাঃ সিংহের বিবরণ পড়ে মনে হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্বেই বাংলায় *subinfeudation, produce rent* এবং *wage labour* বিকাশমান ছিল। কলকাতার বাবু সমাজে যাঁরা বেশ জাঁকিয়ে রাজত্ব করছিলেন, তাঁরা ইংরাজ শাসনের সৃষ্টি এবং প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার সুবিধা ভোগী।

ডাঃ সিংহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অবশ্য বিষয়টি বহুল আলোচিত। ইতিপূর্বে ডাঃ রাধাকুমুদ, পাম দত্ত, অশোক মিত্র, ডাঃ অমলেশ ত্রিপাঠী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়। সাধারণ ভাবে সুবিদিত বক্তব্যগুলিকে ডাঃ সিংহ নতুন তথ্যের সাহায্যে আরো শক্তিশালী করেছেন, এবং কয়েকটি বিষয়ে (যথা পাট্টা প্রথা, লাটদারি ও নিলামদারি প্রথার বিকাশ, পত্তনী প্রথা) নতুন আলোকপাত করেছেন। পাঁচ সালা বন্দোবস্তের সময় পাট্টা প্রদানের কথা উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করা যায় নি কিছু। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও পাট্টার বিধান ছিল, কিন্তু দেখা গেল বিষয়টি বেশ জটিল। জমিদার পাট্টার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিল না। এর কারণ দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু গোল বাধাল রায়ত, পাট্টা নিতে তারও আপত্তি। পাট্টা থেকে নতুন বিপত্তির

আশঙ্কা তার মনে দৃঢ়। প্রথমত নতুন পাট্টায় খাজনার হার বর্ধিত হতে পারে। জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ তখনকার অবস্থায় বেশি ছিল, স্বভাবতই তারা প্রজার উপর খাজনার ভার চাপিয়ে দিতে চাইবে। দ্বিতীয়ত পাট্টা নিতে গিয়ে লুকানো জমি বেরিয়ে পড়া এবং তার উপর খাজনা ধার্য হবার আশঙ্কা ছিল। তৃতীয়ত রায়তের জমির সীমানা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য ছিল। চতুর্থত যারা ফসলে খাজনা দিত, তাদের কি শর্তে পাট্টা দেওয়া হবে? পঞ্চমত কোনো কোনো জেলায় (যেমন রাজশাহী) বড় রায়ত কম খাজনা দিত, আর ছোট রায়তের খাজনার হার বেশি ছিল। এই অবস্থায় পাট্টা সম্পর্কিত বিধান ব্যর্থ হলো। অবশ্য রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে জমিদার, তালুকদার এবং জমির অন্যান্য মালিকদের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হল (ডাঃ সিংহ Regulation XVII উদ্ধৃত করেছেন)। ডাঃ সিংহের মতে এই আইন "জমিদারের স্বার্থে রচিত" এবং এর ফলাফল হয়েছিল "অত্যন্ত ক্ষতিকারক"। জমিদাররা ক্রমশ জমির খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ পেলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল স্বরূপ পত্তনী প্রথা, লাটদারি, নিলামদারি গড়ে ওঠে। বর্ধমানের মহারাজা পত্তনী প্রথার প্রবর্তক। লাটদার এবং নিলামদার এক নতুন শ্রেণী। এরা কেউ বণিক, কেউ জমিদারের গোমস্তা, কেউ সরকারী কর্মচারী। জমিদারদের জমি নিলামে উঠলে, এই অর্থবান শ্রেণী ঐ জমি কিনে নেয়। বুকানন দিনাজপুরে "লাটদার" এবং রংপুরে "নিলামদার" দেখেছিলেন; প্রজাদের এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা লোকগুলি সম্পর্কে আদৌ শ্রদ্ধার ভাব ছিল না এই লোকগুলি সাধারণত গ্রামেই বসবাস করতেন। (পৃঃ ১৬৪-৬৭, ১৬৯; ১৭১-৭২, ১৭৬-৭৭)।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত চাষীর একটানা বিড়ম্বিত জীবনের ঘটনাই চোখে পড়ে। তার উপর দিয়ে গেছে মন্বন্তর ও মহামারীর তাণ্ডব। নতুন ইজারাদারি প্রথার তলায় সে পিষ্ট হয়েছে। পাট্টা প্রথা ব্যর্থ। ১৭ নং রেগুলেশনের বলে জমিদার বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। জমিতে চাষীর প্রাচীন অধিকারগুলি নিশ্চিহ্ন। চাষীর মধ্যে স্তর বিভাগ সুস্পষ্ট—বড় রায়ত, ছোট রায়ত, আধিয়ার, ক্ষেতমজুর। কুটির শিল্পের কারিগর বৃত্তিচ্যুত। জমির উপর চাপ ক্রমবর্ধমান। এই পটভূমিতে কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর পূর্ণিয়া, বীরভূম জেলায় কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের খবর জানা যায়।

ডাঃ সিংহের মতে এই "petty peasant revolts" সম্পর্কে অতিরঞ্জিত গুরুত্ব আরোপ অসমীচীন। রংপুরে দেবী সিংহের বিদ্রোহ (১৭৮৩) "শুধু কৃষক বিদ্রোহ নয়", জমিদাররাও এতে যোগ দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ-কেও "বিদ্রোহ" আখ্যা দিতে তিনি কুণ্ঠিত (পৃঃ ১৯৮-৯৯)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্থনৈতিক ফলাফল বর্ণনা করে ডাঃ সিংহ তাঁর বই শেষ করেছেন। শেষ অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো গেল না: "Increasing population, rising rents, lower and lower standards of living for people employed in agriculture, were new features of agrarian economy. The rural community became progressively poor.…no active provision was made for the protection of the rights of the tenantry. The *Patta* regulation was a dead letter. There was no speedy and equitable justice. But the government persisted for many years in regarding this erroneous system as sacrosanct. The victims of a perverse economy were powerless to check its exactions."

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে ডাঃ সিংহের এই মন্তব্যের সঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির মতের পার্থক্য মৌলিক। দত্ত এবং মুখার্জি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে মত প্রকাশ করে গেছেন। ডাঃ সিংহের মন্তব্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে নতুন ঐতিহাসিক উপলব্ধি আনতে সাহায্য করবে। তবু মনে হয় তাঁর বক্তব্যে একটু ফাঁক আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে কৃষি-উৎপাদনের সম্পর্কের বিষয়টি তাঁর সমগ্র আলোচনা থেকে বাদ পড়েছে। নতুন ভূমি-ব্যবস্থার লোহার শিকলে আবদ্ধ বাংলার কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কি ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হয় নি? মধ্যস্বত্বভোগীর ডালপালা বিস্তার, লাটদারি-নিলামদারি প্রথার বিকাশ, বর্গা প্রথায় চাষের ব্যাপকতা কি কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বিস্তর নতুন জমি আবাদযোগ্য হয়েছে, এতে জমিদারদের মোটা লাভের উৎস উন্মুক্ত হয়েছে, কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন হ্রাস কি এই পর্বের বৈশিষ্ট্য নয়? মনে হয় কৃষি-প্রধান বাংলায় কৃষি-উৎপাদনের ক্রমাবনতির বিষয়টি আলোচিত হলে, সেই বিষণ্ণ যুগের উপলব্ধি আরো পরিষ্কার হয়।

ছাপাখানার কাজ সুন্দর। মুদ্রাকর প্রমাদ বেশি চোখে পড়ে না। প্রচ্ছদপটের ব্যাপারে প্রকাশক তেমন নজর দেন নি। এই বই পাঠক সমাজে বিপুল সমাদর লাভ করবার দাবি রাখে।

সুনীল সেন

মানুষের মত মানুষ। বরিস পলেভয়। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো থেকে প্রকাশিত। অনুবাদ : সমর সেন। আড়াই টাকা।

"সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" আলেক্সেই মারেসিয়েভের কীর্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় এই বইটিতে পাওয়া যাবে। কোনো মহান-আদর্শের প্রতি আনুগত্য কোনো একজন মানুষকে যে 'বিশেষ ধরনের মানুষের' মর্যাদা এনে দিতে পারে তারই একটি উজ্জ্বল আলেখ্য এ বইটি। অথচ সাধারণ ধারণা অনুযায়ী 'জীবনী' বলতে যা আমরা বুঝে থাকি তার থেকে এর পার্থক্য অনেক।

১৯৪১ সাল। সোভিয়েত জঙ্গী বৈমানিক আলেক্সেই মারেসিয়েভের বিমানকে জখম করে নামায় শত্রুপক্ষ। ভাঙা পায়ে, দারুণ শীতে, ক্ষুধায় কাতর এই লোকটিকে এগারো দিন হামাগুড়ি দিয়ে শত্রু এলাকা অতিক্রম করতে হয়। পরে হাসপাতালে তার দুটো পায়ের পাতা কেটে বাদ দিতে হলো। বহুদিনের স্বপ্ন তার—জঙ্গী বৈমানিক হওয়া। সঙ্কল্পে অটল মারেসিয়েভ তার অক্ষম শরীরকে তালিম দিয়ে পুনরায় ফিরে পেল বিমান চালানোর দক্ষতা ও দুর্জয় স্বীকৃতি। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বৈমানিক বাহিনীর একজন 'অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি' হিসেবে রয়ে গেল। তার শৌর্যের জন্য তাকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাব দেওয়া হয়।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোভিয়েত দেশে যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে—বিগত মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা তার জন্যে অনেকটা দায়ী। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে প্যারিসে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে আলেক্সেই মারেসিয়েভের ভাষণটি সেদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

"…আমরা, সকল দেশের নবীন মানুষেরা যুদ্ধের সমস্ত ধকল সই, রাইফেল হাতে প্রাণ সংশয় করে যৌবনের সেরা দিনগুলি কাটাই সে কি শান্তিপূর্ণ কাজ ছেড়ে আবার ট্রেঞ্চে ফেরার জন্যে? না, শতবার বলি, না…"

আলোচ্য গ্রন্থটি যদিও যুদ্ধের পটভূমিকায় সোভিয়েত বাহিনীর বীরত্বের কাহিনী আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তবুও এর প্রতিটি ছত্রে যুদ্ধের উন্মাদনাকে

ধিক্কার দেওয়া হয়েছে—এ কাহিনীর মূল স্বর "শান্তির জন্য সংগ্রামের চেয়ে মহৎ ও গৌরবের কাজ আর কিছু নেই"।

ওয়ার লিটারেচরের বক্তব্য এমনিই। যুদ্ধের বীভৎসতা আর কুশ্রীতাকে উদ্ঘাটন করাই তার কাজ। 'মানুষের মত মানুষে'ও তার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহ, যেগুলি যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত, তাদের সঙ্গে এক সারিতে পাশাপাশি রেখে দেওয়া যেতে পারে এই বইটিকে। 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'-এর মতই কালজয়ী হতে পারে এই কাহিনী।

মূল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন সমর সেন। আশ্চর্য প্রাঞ্জল তাঁর অনুবাদ। এত স্বচ্ছ যে সময়ে সময়ে মূল বাঙলা উপন্যাস বলে মনে হয়। কয়েকটি ছবি খুব সুন্দর। ছাপা বাঁধাই ইত্যাদি প্রকাশকদের পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। দামও বেশ সস্তা।

বইটির অনেক বেশি প্রচার কামনা করি।

কৌতুকপুরের রূপকথা॥ তারকদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : পুঁথিঘর, কলকাতা-৯। দাম সাত টাকা।

চারশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার এই বিশাল উপন্যাসখানি বাঙলাদেশের গ্রামজীবনের একখানি অপরিস্ফুট আলোকচিত্র। কৌতুকপুর নামের একটি গ্রাম, তার বাসিন্দা পঙ্কু দুলে আর পাশের গ্রাম দুর্গাপুরের সাবি বলে একটি অকাল বিধবা —ওদের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে একের পর এক ঘটনাপ্রবাহ। তদনুযায়ী সংঘাতও আছে অনেক।

বিশ শতকের ছয়ের দশকে উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তার সঙ্গে 'কৌতুকপুরের রূপকথা'র কাহিনী, চরিত্র এবং এককথায় উপন্যাসত্বের দিক দিয়ে প্রভেদ বিস্তর। বরং এ কথা বলাই শ্রেয় যে বইটি প্রাচীন পুরনো সাহিত্যরুচি ও ধারার লক্ষণাক্রান্ত। আধুনিক পাঠকবর্গ, যাঁরা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনে কিংবা তৎসম্বন্ধীয় বস্তুপ্রভাবে কিঞ্চিৎ বেশি উৎসাহী, তাঁরা এ গ্রন্থে সন্তুষ্ট হবেন না। এর জন্যে বোধকরি লেখকের অত্যধিক সরলতা, সহানুভূতি ও তজ্জনিত আবেগপ্রবণতাই দায়ী। এমনকি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মতো উপন্যাসগুলি আমাদের কৌতূহলী চোখের সামনে অন্ত্যজ সমাজের যে-চিত্র প্রক্ষেপণ করতে পারে আলোচ্য গ্রন্থটি সুলিখিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে অসমর্থ। গ্রাম্য চরিত্রানুযায়ী লৌকিক ভাষায় সংলাপ ব্যবহারের

ক্ষেত্রে লেখক সার্থক। সাবি ও পঙ্কুর হৃদয়যন্ত্রণা ও পল্লীসমাজের বিরুদ্ধ স্রোতধারা কোনো কোনো স্থানে নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কয়েকটি টাইপ চরিত্র মনে রাখবার মতো।

ইতোপূর্বে তারকদাসবাবুর কোনো বই পড়বার সৌভাগ্য হয়নি, তথাপি আশা করব আগামী উপন্যাসে তিনি আরো স্বচ্ছন্দ, অকৃত্রিম ও সার্থক হতে পারবেন।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

যখন যেখানে॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়॥ বর্তিক। মূল্য ছ টাকা পচাত্তর নয়া পয়সা॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি। তার গদ্য রচনায় কবিতার আমেজ বার-বার উঁকি দিয়েছে। বিশেষ করে উপমার বহুল প্রয়োগ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যভঙ্গির একটি বৈশিষ্ট্য হলেও সে-বৈশিষ্ট্যে তাঁর কবি-সত্তার আধিপত্যই লক্ষ্য করা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার যাঁরা পাঠক, তাঁরা 'যখন যেখানে' পড়ে এমন বহু পংক্তির সাক্ষাৎ পাবেন, যা তাঁর কবিতায় পূর্বেই পেয়েছেন। কোনো কোনো সময় আলোচ্য গ্রন্থের বহু উপমা ও বাচন-ভঙ্গী তাঁর কাব্যেও স্বচ্ছন্দে ঠাঁই পেয়েছে। "হোস্-পাইপের গলা ফাটিয়ে মাটি গোলা জল", "ঠিকে ঝি বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো জোরে জোরে যখন কড়া নাড়ে", "আহ্লাদে সোনালি রেল", "বড় বড় বাড়ির বগলের নিচ দিয়ে গলে-আসা এক পাল কচি রোদ", "ডানপিটে রোদগুলো" ইত্যাদি বহু উপমা উদ্ধার করে বলা যায় নিছক গদ্য-শিল্পী নিশ্চয়ই এমন বাচনভঙ্গির আশ্রয় নিতেন না, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁদের আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না, যে 'যখন যেখানে' পুস্তকের বলার ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর শেষ-দিককার কবিতার ("ফুল ফুটুক না ফুটুক" পর্যায় থেকে) আশ্চর্য মিল আছে। কবিতায় তিনি যেমন গল্প বলার ধরণ গ্রহণ করেছেন, বর্তমান গদ্য-গ্রন্থে তার বিশেষ ব্যত্যয় ঘটে নি। বলা যায় তাঁর গদ্যে কাব্য ও গদ্যের হর-পার্বতীর মিলন হয়েছে, কবিতায় গদ্য ও কাব্যের। পথিক পথ অতিবাহন করে, সেই পথ-পরিক্রমায় হয়তো সে কিছু লক্ষ্য করে, কিছু এড়িয়ে যায়। তাই পথিক-চোখ নিয়ে কখনই কোনো ভালো রচনা সৃষ্টি করা যায় না, কারণ ভালো রচনার মূল কথাই হলো অন্তরঙ্গ-দৃষ্টি, আত্মীয়তা অথচ সেই দৃষ্টি বা মনোভাব কখনই আবিল বা মোহগ্রস্ত নয়। 'যখন যেখানে' প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে এই পথিক-চোখ নিয়ে লেখা কয়েকটি

রিপোর্টাজের সমষ্টি। অথচ এগিয়ে গেলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আশ্চর্য অনুভূতি, আত্মীয়তা এবং অতি তুচ্ছ নগণ্য জিনিসও মানুষের প্রতি অসীম দরদ ছত্রে ছত্রে ব্যাপ্ত হয়ে রচনাগুলিকে রসোত্তীর্ণ অনন্য করে তুলেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে গল্পের আমেজ প্রবেশ করিয়ে কৌতূহল জাগ্রত রেখেছেন। বিশেষ করে প্রায় প্রতি রচনার শেষের দিকে গল্পের সাস্‌পেন্সও অতি সূক্ষ্ম ভাবে জিইয়ে রেখে লিপি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সহজ করে বলা সহজ নয়। কিন্তু যিনি সহজ করে বলতে পারেন, তিনি যে কিস্তিমাতও করেন, 'যখন যেখানে' পড়লে বোঝা যায়। "বাবর আলির চোখের মতো", "লিখতে বারণ", "একটি অমানুষিক কাহিনী", "আমাদের গাড়ি" প্রভৃতি রচনায় হঠাৎ হঠাৎ বিষণ্ণতার প্রলেপ লাগিয়ে লেখক ট্র্যাজেডির একটি নিভৃত সুর যোজনা করেছেন, ফলে লেখাগুলি তাদের চটুল ভঙ্গি, লঘু আবরণ ছিন্ন করে গভীর হয়ে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃশ্য-ইন্দ্রিয় অতি প্রখর। কবিতায় যেমন তিনি চিত্রের পর চিত্র রচনা করে সমস্ত বিষয়কে সম্মুখে ভাসিয়ে তোলেন, 'যখন যেখানে' গ্রন্থেও তেমন বহুচিত্র যোজনা করে তেমনই সফল হয়েছেন। প্রথম রচনা "এইটুকু"র পৃষ্ঠা তিনেকের মধ্যে উপমা ও সরল বাচনভঙ্গির সাহায্যে পর পর কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করে নেবুতলার গলির স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, এই চিত্রই গল্পের শেষ অংশে নিবারণবাবুর কাহিনীকে পূর্ণতাদান করেছে এবং নেবুতলার গলির চিত্রটির সঙ্গে নিবারণবাবুর জীবন কাহিনী তাই একান্ত হয়ে উঠেছে। তবু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আশ্চর্য গদ্যে বাস্তবের রুক্ষ, রূঢ় রূপটি অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। অতি তুচ্ছ নগণ্য ঘটনা, দুঃখ-দারিদ্র্য, নিষ্ঠুরতা সকল রকম চিত্রই আমরা পাই, কিন্তু সেই দুঃখ দারিদ্র্য, শঠতা, হীনতার উত্তাপ আমাদের জ্বালিয়ে দেয় না। এজন্য হয়তো লেখককে দোষী করা যায় না, কারণ তাঁর রচনার মধ্যে রূপকথার আমেজটি অতি অচেতনেও লেগে যায়, তাই যখন তিনি তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা আঁকতে যান, তখন তা ভাবালুতায় পরিণত হয়, "একটি প্রতিবাদ পত্র" তার অন্যতম নিদর্শন। এমন রচনায় তাঁর গল্প-বলার সহজ ভঙ্গিটি অবশেষে ভাবালুতার আশ্রয় নেয়। তবু সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য-শিল্পী হিসেবে সফল এবং অনেক গদ্য-শিল্পীর ঈর্ষার পাত্র, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর সহজ, সরল, কাব্যময় উপমা প্রয়োগের ভঙ্গি, কথকতার অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি সম্মিলিত হয়ে গদ্য-রচনাকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য-রচনায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার সহজ, সরল অথচ রসোত্তীর্ণ ভঙ্গি অনেক গদ্য-শিল্পীর শিক্ষার বিষয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা আরও গদ্য-রচনা আশা করি।

কুশল লাহিড়ী

'অভিযান প্রসঙ্গে'

'পরিচয়'-এর চৈত্র এবং বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীধ্রুব গুপ্ত-কৃত 'অভিযান' সম্পর্কিত আলোচনা প্রশংসার্হ। এই প্রসঙ্গে আমি কিঞ্চিৎ বক্তব্য 'পরিচয়'-এর বিদগ্ধ পাঠকগোষ্ঠীর সম্মুখে উপস্থিত করতে ইচ্ছুক।

ধ্রুব গুপ্ত 'অভিযান' চিত্রে সত্যজিতের অধোগতির দুঃখ ভুলতে চেয়েছেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়াসের প্রবহমানতা দেখে। কিন্তু আমি দুঃখিত, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমাকে তেমন ভরসা দিতে অক্ষম হয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের পটভূমিতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র অভ্যুদয় ঈষৎ অভিনব বোধ হলেও এর গুরুত্ব মোটেই বিবেচনার যোগ্য নয়। সত্যি বলতে কি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইতালীয় এবং ফরাসী চিত্রের প্রভাব কি আঙ্গিকগতভাবে কি অন্তররূপে এই চিত্রটির ওপর এমন নিদারুণরূপে প্রকট যে, কোনো অদূর ভবিষ্যতে এই চিত্র পাশ্চাত্যদেশে মুক্তিলাভ করতে পারে এবম্বিধ সম্ভাবনায় আমি রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করি। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে গভীরতার অভাব এমন বেদনাদায়কভাবে সঞ্চারিত যে সত্যজিতের আশ্চর্য প্রতিভার সঙ্গে এর যোগাযোগ কল্পনা করে নিতে ক্লেশবোধ হয়। সত্যজিৎ রায়ের 'অপু' চিত্রত্রয়, 'দেবী', এমনকি 'জলসাঘর'-এও মুগ্ধ হওয়ার মতো অজস্র উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কিন্তু সমগ্র 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও আমি একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত খুঁজে পেতে সক্ষম হই নি। একমাত্র নায়ক-এর দুরূহ চরিত্রটিতে নবাগত অরুণ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয় আমার নিকট সমগ্র চিত্রের একমাত্র সম্পদ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, একটি নিটোল কাহিনীর অনুপস্থিতি আমাকে মোটেই পীড়িত করে নি, কিম্বা বিনা-টকীকরণের প্রয়াসও আমার নিকট মোটেই নিরানন্দজনক বোধ হয় নি, কিন্তু কাহিনীতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থের বাইরেও অপর একটি উপাদান আমি কামনা করি, তা হলো বেধ—বক্তব্যের, বা উপলব্ধির গভীরতা। কিন্তু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রঙীন চিত্রাবলীর ক্যাকাসে অবয়বে ঐ বস্তুটির একান্ত অভাব আমাকে বিমর্ষ করেছে। একটি লক্ষণীয় বিষয়, ক্যামেরার শাদা-কালোর তুলিতে পর্দার বুকে 'টোন'-এর যে গভীরতা এবং সংহতি সূচিত হয়, রঙীন ছবি তা

প্রায়শই সার্থকভাবে পানসে করে ফেলে। সম্ভবত এ কারণেই বিশ্বের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ চিত্ররাজির তালিকায় রঙীন চিত্রের স্থান ব্রাত্যের কোঠায়।

একটি আধুনিক কবিতায় বা একটি সার্থক আধুনিক ছোটগল্পে যা আকাঙ্ক্ষণীয়, একটি সার্থক আধুনিক চলচ্চিত্রের কাছেও আমার তাই দাবি; অর্থাৎ প্রতীক, চিত্রকল্প, ইঙ্গিতধর্মিতা এবং নিরন্তর আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সত্যজিতের অপরাপর চিত্ররাজি এসকল গুণে বিভূষিত ছিল। তাই সমগ্র বিশ্বে তাঁর আগমন চিত্ররসিকমহলের স্বাগত দৃষ্টি উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং শেষতম চিত্র 'অভিযান'-এ উপরোক্ত গুণাবলীর অন্বেষণে আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিও ব্যর্থমনোরথ হবে। তাছাড়া যে সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ, যে অনুভূতির গভীরতা এবং আঙ্গিকের আনন্দদায়ক অভিনবত্ব তাঁর প্রতিটি চিত্রকে চিহ্নিত করেছে, হায় 'অভিযান'-এর অপরিসীম স্থূলত্বের চোরাবালিতে তার জীবাশ্মটুকুও অন্তর্হিত। সমগ্র চিত্রটির মধ্যে একটি (আশ্চর্য একটিও) স্মরণযোগ্য Visual image বা Symbol বা Details-এর কাজ নেই। সিগারেট লাইটারের হস্তান্তর, 'ক্রাইসলার'-আরোহী নরসিংহের চোখে অশ্বারোহী রাজপুত্রের মানসচিত্র ফুটে ওঠা, গভীর রজনীতে প্রিয়া-সমাগমে আগত নরসিংহের টর্চের আলোর সামনে একগুচ্ছ পাহাড়ী ফুলের উদ্ভাস—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিতময়তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, তা চলচ্চিত্রের নাবালক বয়েসে হয়তো সহ্য করা যেত, কিন্তু বিংশ শতকের এই ষষ্ঠদশকে কদাপি নয়।

'অভিযান' দর্শনের পর যে ভাবনা আমাকে সর্বাধিক পীড়িত করেছে, তা হলো এই যে, যথার্থ শিল্পীর সমাদর শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের হাতেও কত না বিড়ম্বিত! নরসিংহের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এককথায় অসাধারণ, অন্তত আমার জ্ঞানোন্মেষকালমধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রে আমি এমন একটি চরিত্রচিত্রণ কালেভদ্রে প্রত্যক্ষ করেছি। কিছুকাল আগে Forbidden Christ (পরিচালকের নাম স্মরণে আনতে পারছি না) এবং Rocco & His Brothers (পরিচালক—ভিসকাউন্টি) নামক দুটি ইতালীয় চিত্র দর্শনের সুযোগ হয়েছিল (দুর্ভাগ্যবশত ঐ চিত্রদ্বয় এখনও ভারতবর্ষে মুক্তিলাভ করে নি)। ঐ চিত্রদ্বয়ে নায়কের ভূমিকাভিনেতা অভিনেতৃদ্বয়ের অভিনয় বহুকাল আমার শিল্পবোধকে আন্দোলিত করেছে

এবং অপরাপর শ্রেষ্ঠ বিদেশী চলচ্চিত্রেও আমি ঐ পর্যায়ের অভিনয়-মান খুব বেশি দেখি নি। 'অভিযান'-এ নায়কের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণকে ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্লেষণ সুষমায় আমার নিকট উপরি-উল্লিখিত অভিনেতাদ্বয়ের চরিত্রায়নের সমপর্যায়ের বলে বোধ হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী হয়েও জনরঞ্জনের সঙ্গে আপস করতে অগ্রসর হলে কি নিদারুণ ট্র্যাজেডির উদয় হয় তার দৃষ্টান্ত নগণ্য নয় চিত্রজগতেও; সে সংখ্যা বোধ হয় অগণিত। 'Bicycle Thief', 'Miracle in Milan' ইত্যাদি কালোত্তীর্ণ চিত্রের স্রষ্টা ডি সিকা কর্তৃক 'Two Women'-এর মতো অতি সাধারণ মানবিশিষ্ট চিত্র উৎপাদন, 'Ilcride'র তুল্য উজ্জ্বল চিত্রের পরিচালক মাইকেল অ্যাঞ্জেলো অ্যান্টোনিওনির শিল্পাগারে L' Aventura (বানান সম্বন্ধে নিশ্চিত নই) এবং 'La Notte'র জন্মলাভ, 'The Seventh Seal'-এর স্রষ্টা ইংমার বার্গ্‌ম্যানের হাতে 'The Virgin Spring'-এর মতো অসাধারণত্ব বর্জিত চিত্রসৃষ্টি, ভিসকাউন্টির তুল্য প্রতিভাবান পরিচালকের শেষ পর্যন্ত 'Rocco and his Brothers'-এর মতো জনপ্রিয় কিন্তু শিল্পরসের বিচারে স্থূলত্বপূর্ণ চিত্রে অবতরণ, ফেলিনির মতো পরিচালকের 'La Dolce Vita'র অনুরূপ জনরঞ্জক চিত্রসৃষ্টি—ঐ ট্র্যাজেডিরই ফলশ্রুতি। বাংলা চিত্রজগতেও এমন দৃষ্টান্তের ন্যূনতা নেই। 'বাইশে শ্রাবণ' এবং 'পুনশ্চ'র স্রষ্টা মৃণাল সেনের 'অবশেষে', 'অন্তরীক্ষ' এবং 'গঙ্গা'র স্রষ্টা রাজেন তরফদারের 'অগ্নিশিখা, 'কাবুলীওয়ালা' এবং 'ক্ষণিকের অতিথি'র স্রষ্টা তপন সিংহের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'চলাচল' এবং 'জোনাকীর আলো'র স্রষ্টা অসিত সেনের 'দীপ জেলে যাই' ইত্যাদি প্রতিভাবানের অপমৃত্যুরই করুণ স্বাক্ষর।

অশোক মুখোপাধ্যায়

প্রতিপাদের প্রতিবাদ

'অভিযানে'র আলোচনা প্রসঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নামক "মনুষ্যে"-র উক্তিটি আমি দিল্লীর ইংরেজি সাপ্তাহিক 'Link'-এর ৩০.৯.৬২ তারিখের সংখ্যার ৩৯ পৃষ্ঠায় পেয়েছিলাম। সেখানে 'অভিযান' সম্পর্কিত এক আলোচনায় লেখা হয়েছে: "Soumitra Chatterjee declares that while working in Abhijan, "I came to feel that Narsingh represents our moral crisis of today—that to rise men feel they are justified to go through sin···because people won't let us stand on our legs"······ অতএব শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে আমার পরামর্শ এই যে তিনি দায়িত্বজ্ঞান শিক্ষা দেবার নিমিত্ত Link পত্রিকার কার্যালয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন।

ধ্রুব গুপ্ত

আপেক্ষিকতাবাদ কি কোনো বিপ্লব ?

গত চৈত্র সংখ্যা 'পরিচয়'-এ শ্রীযুক্ত জীবেন সিদ্ধান্ত লিখিত "আপেক্ষিকতাবাদ কি কোনো বিপ্লব" শীর্ষক বিজ্ঞানালোচনা পড়ে সবিশেষ আনন্দিত হলাম। বহুদিন ধরে এ রকম একটি আলোচনা পড়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ছাত্ররা দর্শন জানে না, দর্শনের ছাত্ররা বিজ্ঞান বোঝে না এ একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। জীবেনবাবু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। সেদিক থেকেও জীবেনবাবু ধন্যবাদার্হ। এদেশের বিজ্ঞানের ছাত্রদের দার্শনিক অনুপপত্তি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ বোধহয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার জনৈক বন্ধুকে (পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী) প্রসঙ্গক্রমে যখন বলা হলো যে নব্যবিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার (বস্তু এবং শক্তির সম্পর্ক বা বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কিত) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদেরই সমর্থক যেমন শ্রোয়েডিঙ্গার-এর Wavecle বা শক্তির কণিকাবাদ এবং বস্তুর তরঙ্গবাদ ইত্যাদি তখন তিনি বিস্মিতবোধ করলেন। তারপর Classical Physics-এ ফিরে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হলো যে Newton এবং Laplace ব্রহ্মাণ্ডকে একটি বিরাট যন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যান্ত্রিক এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট করে দেওয়া। কিন্তু সাতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে তিনি পদার্থবিদ্যায় কৃতবিদ্য হয়েও পদার্থবিদ্যার দার্শনিক

ভিত্তি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। এর থেকে একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রম অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করব তিনি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলিতে আপন আপন 'বিজ্ঞান চিন্তার ইতিহাস' অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন।

জীবেনবাবু খুব কম কথায় আইনস্টাইন-এর "দাবির রূপরেখা" অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মার্কসের সঙ্গে আইনস্টাইন-এর সাযুজ্য খুবই সার্থক। আধুনিক ইওরোপীয় দর্শনের জন্মলগ্নে অভিজ্ঞতাবাদী এবং বিজ্ঞানবাদীদের দ্বন্দ্বের শুরু আর সমাপ্তি আইনস্টাইনে, এখানেও Diamat এরই জয়জয়কার। এহেন দুরূহ জ্ঞানতত্ত্ব অত্যন্ত প্রাঞ্জল করে বলাতে বোঝার কোনোই অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু জীবেনবাবু যে কেন আপেক্ষিকতাবাদকে বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব বলতে চান না তা বুঝতে পারলাম না। জীবেনবাবুর নিজের কথাতেই বলি: "বিজ্ঞানের রাজ্যে এই 'মনিজম্'-এর আস্পৃহা সমকালীনদের মধ্যে একটা বিপ্লবের মতো এসেছিল।" আবার পরের লাইনেই তিনি লিখেছেন, "কিন্তু জন্মসূত্রে আপেক্ষিকতাবাদ কোনো বিপ্লব, না পূর্বসূরীদের সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি ?" এই প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজেছেন স্বয়ং আইনস্টাইনেরই অতি বিনীত উক্তিতে: "We have here no revolutionary act but a natural continuation of a line that can be traced through the centuries."

Relative Theory অবশ্যই পূর্বসূরীদের সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি এবং সমস্ত বিপ্লবই কি তাই নয় ? এত বড় রেনাসাঁ বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব তাও কি পূর্বসূরীদের সাধনার ফল নয় ? সমস্ত ঐতিহাসিক বিপ্লবই মানুষের সংগ্রামের স্বাভাবিক পরিণতি। বিপ্লব বিচারের মাপকাঠি কি ? হঠাৎ আকাশ থেকে টুপ করে পড়া না পরিবর্তনের মাত্রা ? ইতিহাস-অভিজ্ঞ লোক অবশ্যই দ্বিতীয়টিই বলবেন। Spl. Theory of Relativity সমকালীন বিজ্ঞানের নৈয়ায়িক অনুক্তিপূরণ এবং একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার কারণ সে আবিষ্কার স্থান, কাল, ভর, শক্তি ইত্যাদি প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন এনেছে তাকে বৈপ্লবিক না বলা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত তা জীবেনবাবুই ভালো বলতে পারেন। আমার বক্তব্য জীবেনবাবু যে ভাবে চিন্তা

করেছেন ঐ ধারায় চিন্তা অত্যন্ত কার্যকরী। তিনি যদি আরও নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম করে একখানা বিজ্ঞান চিন্তার ইতিহাস বাংলায় লেখেন, আমার মনে হয় তাতে হঠাৎ নতুন কিছু বলার থেকে অনেক বেশি উপকার হয়।

তিমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শিল্পীর স্বভাব ও স্বধর্ম

ভগবান শ্রীশ্রীরামপ্রসাদের গানে আছে :

আয় মন বেড়াতে যাবি
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি
তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি

ধর্মাধর্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি

প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি ॥

কারণ তিনি "মনের মত মন" হবার কথা বলেছিলেন। ঔপন্যাসিক অসীম রায়ও তাঁর যুক্তি বিবেচনা ও অভিজ্ঞতামতো "মনের মত মনে"র কথা তোলেন 'পরিচয়ে'র পাতায় যোগী কর্মী ও শিল্পীর অতি সরল একটি লৌকিক বিভাগে। "মনের মত মন" চাই যেহেতু অসীম রায় শিল্পীর স্বধর্ম বুঝতে চান, যেহেতু তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে পথ খুঁজতে চেয়েও খোঁজেন নি প্রশ্নের প্রবল চাপে, তার দীপ্ত প্রবহমান চারিত্র্যে। অথচ ভারতবর্ষের মৌলিক একটি প্রত্যয় তিনি আলোচনায় তোলেন, জানতে চান শিল্পীর "স্বধর্ম" কি।

কী সেই স্বধর্ম? অসীম রায়ের ভাষ্যে আছে "যোগী ও কর্মীর এই শিবির একই সঙ্গে শিল্পী গ্রহণ করেন বলে সভ্যতার ভবিষ্যতের দিক থেকে তাঁদের কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মূল্যবোধেই বলা যেতে পারে মানব সভ্যতার মুক্তি। বাস্তবিক তাঁরা রামকৃষ্ণের জনক রাজা যিনি 'ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি'।" বোঝা গেল শিল্পী জনক রাজা হবেন। কিন্তু হবেন কেন? হবেন কেমন করে?

অসীম রায় এই প্রশ্ন দুটি তোলেন না, অথচ এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই আসে শিল্পের বোধ, শিল্পীর আনন্দরূপ ও অমৃতের কথা। তিনি যে প্রশ্ন তোলেন নি তার কারণ তিনি তুলবেন না বা তুলতে পারবেন না। ওঁর মনে শিল্প বলতে নিছক প্রকাশটাই সত্য, যিনি প্রকাশ করেন তিনিই শিল্পী। যোগীর সঙ্গে তুলনায় অসীম রায়ের প্রবচনটি স্পষ্ট হয় "যিনি ভক্ত বা যোগী তাঁর প্রকাশে প্রয়োজন নেই", প্রকাশের প্রয়োজন একমাত্র শিল্পীর। কিন্তু কেন? প্রকাশ তো সবাই করেন কম বেশি, অধিকারভেদে নিজের নিজের সীমায়। কারণ প্রকাশই জীবন এবং মহাজীবনের মহাশিল্পী প্রতিনিয়ত সরিক হন আমাদের দৈনন্দিনের ছায়া-আলোয়, আনন্দ-বেদনায়, অস্তি ও নাস্তিতে। আমরা হয়তো জানতে পারি না, জানার দরকার বোধ করিনি কখনো। অভিব্যক্তির যে কোনো পর্বেই, জড় থেকে প্রাণ সর্বত্রই প্রকাশের ভাঙা গড়া। প্রকাশের গর্ব শিল্পীর তফাৎ করে কেন! আর যদি গদ্য পদ্য চিত্র ভাস্কর্যে রূপারোপের কথা ওঠে, তবে তার সঙ্গে যোগীর তফাৎ কোথায়? তফাৎ তো নিছক কর্মে। কর্মের ধারায় ও কর্মের ঢঙে।

অসীম রায় জানেন না যে যোগীও শিল্পী, যোগীই মহাশিল্পী। কারণ তিনি নিজের জীবনকে শিল্প করে তুলেছেন, নিজেই প্রতিমুহূর্তের বিন্দুতে অস্থিরতায় স্থিরতার কেন্দ্র হয়েছেন, নির্মম নির্মোহে নিজেকে ভেঙে গড়ে স্তব্ধ হয়ে আছেন মহাকাশের মৃণালে, আত্মসমাহিতিতে প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মের মতো। কারণ তিনিই প্রকাশ, তিনিই আমাদের লক্ষ্য। আর জানি না কি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ভোলা মহেশ্বর আপনাতে আপনি আত্মস্থ মহাযোগী। মনে করে দেখুন, আমাদের সেই লালাবাবুর কথা। ভোগের চূড়ায় মত্ত পুরুষ বেলা পড়ে আসার সংবাদে কেমন মুহূর্তেই জীবনকে প্রকাশের নির্দয় অকরুণ অভিব্যক্তিতে ঠেলে নিয়ে গেলেন। পুরনো শিকড় ছিঁড়তে, পিছুটান কাটাতে দ্বিধা হল না বারেকের জন্যেও। ভেবে দেখুন ঠাকুরের বিখ্যাত গল্প বিল্বমঙ্গলের কাহিনী। বারবণিতার প্রেমে জগৎসংসার যার কাছে অসার মিথ্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা বিষধর সর্প যিনি অনায়াস নৈরাত্ম্যে পেরিয়ে যান তন্ময় সাধনার ঐকান্তিকতায়। তিনিই যোগী কারণ তিনি নিজেতেই শ্রেষ্ঠ শিল্পের পরিচয় ধরেন অসীম রায়ের ত্রিমূর্তির মতো।

অথচ অসীম রায় ঠাকুরের উক্তিকে ব্যবহার করেন; প্রায় না জেনেই যে, আমরা কেমন সহজে ভুলি ভারতবর্ষের কথা, ভারতবর্ষের মৌল প্রত্যয়গুলি।

নইলে কেমন করে লিখতে পারলেন "ভক্ত বা যোগী"র কেবল "বোধেই শান্তি", "ধ্যানেই আনন্দ"। অসীম রায় কি বিভিন্ন যোগের কথা শোনেন নি কখনো যে ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানীর মার্গ এক নয়? যোগী ও ভক্ত সাধনায় ভিন্ন পথে চলেন? তাঁদের "প্রাত্যহিক রুটিন" "স্রষ্টার ঐশ্বর্যের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত" ও "ভক্তির মাধুর্যে অন্তর ধৌত করা"? "তাঁদের রুটিন"? ইংরেজি কেতার এই কি পরিণাম? ভক্ত সচেতনভাবে ভেবে নিত্যকর্ম তৈরি করেছেন? যোগী তাঁর দিনলিপিতে কর্ম ও কল্পনার খসড়া তৈরি করে রেখেছেন "অন্তর ধৌত" ইত্যাদি! এমন অর্বাচীন শঠোক্তির কারণেই বুঝি তিনি ঠাকুরের উক্তিকে যেমনতেমন ভাবে কেটে প্রসঙ্গচ্যুত করেন। ভক্ত শুধু ভক্তি নিশ্চয়ই চায় কিন্তু অসীম রায় জানেন না ভক্তের কল্পনায় ঈশ্বরের ষড়ৈশ্বর্যরূপ। রূপ, অসীম রায় মনে রাখুন, আনন্দ অমৃত ও রূপেই তাঁর দিব্য প্রকাশ। তাই তো ঠাকুর বলতেন "মা, আমায় রসে বশে রাখিস"। শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মসমাহিতি চান না। শুদ্ধ ভক্তির উদ্ধৃতিতে ঠাকুর ভক্তির কথা বলছেন না, বলছেন 'সত্যের' কথা। অসীম রায়ের বিবেচনায় উদ্ধৃত অংশের প্রসঙ্গ ও শেষ বাদ পড়ে। প্রসঙ্গের শুরুতে আছে "ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট হয়ে যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা! এই নাও তোমার জ্ঞান" আর শেষ হচ্ছে "···শুদ্ধা ভক্তি দাও। যখন এই সব বলেছিলুম, তখন একথা বলিতে পারি নাই, মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ। পৃঃ ১২১-২২)। ভক্তের "পূর্ণভাব এমনই যে এই ঈশ্বর-স্থষ্ট জগৎ চরাচরের ঐশ্বর্যবর্ণনাও বাহ"—সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে এমন রায় অসীম রায়ের পূর্বে আর কেউ দেন নি। ভক্তের অভিজ্ঞানেই স্বষ্টির বিচিত্র লীলা, শিল্পী তো সেই লীলারই ভক্ত। যোগী এই লীলাচক্রের মর্মমূলে দেহতন্ত্রেই বিশ্বতন্ত্রকে পান, তাই তিনি পুরুষ ও প্রকৃতির সত্যকে পরিজ্ঞাত করেন, ইহজীবনের নিত্যদিনের ছলনাজালে স্থিতপ্রজ্ঞ শিল্পীর দৃষ্টিতে রূপ-রস গন্ধকে আস্বাদন করেন। শিল্পীই যোগী, কারণ শিল্পীর নির্মোহ দৃষ্টিতেই ফোটে মহাকালের পদচিহ্ন, অস্থির গোলাপের বিহ্বল রূপক।

শিল্পীর মন হয়তো অসীম রায়ের আয়ত্তে নেই তাই তিনি লেখেন "তাই নিরাসক্ত কর্মের চেয়েও ত্যাগের দিকেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যোগীর লক্ষ্য।" নইলে নিরাসক্ত কর্ম ও ত্যাগের মধ্যে অত্যাশ্চর্য এক বিরোধ তিনি খুঁজে

পেলেন কেমন করে! নিরাসক্ত কর্মই তো ত্যাগ। ঠাকুর গীতার পরিচয় ত্যাগেই দেন, কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি? ত্যাগের অর্থ স্বধর্ম রক্ষা করা, ত্যাগের অর্থ স্বভাবের পরিণতি। কিন্তু কর্মকে অস্বীকার করে নয়। সারা জগৎ ও জীবন তো কর্মের চাকায় বাঁধা। কর্ম থেকে স্বয়ং ঈশ্বরের ছাড়পত্র মেলে না তো যোগীর কথা। রামায়ণ-মহাভারত বারম্বার এ-কথাই কি শেখাচ্ছে না যে ভারতীয় মহাজীবনে অবগাহন করে দেখো জীবন নিয়ত কর্মের প্রবাহে চঞ্চল, ওই তো সেই বিষ্ণুর জল মুহূর্তে মুহূর্তে যাতে রূপ ফোটে, আবার মিলায়, আবার ফোটে আবার মুহূর্ত বিভ্রমে চঞ্চল হয় কামনার কল্পবিন্দুতে। কর্মের টানে স্বয়ং ভগবান আসবেন পৃথিবীতে, তুমি যাবে শৈবলোকে। কর্মের টানে স্বয়ং ভগবান কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে জানান জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পরিণতির কথা। শেখান স্বভাব ও স্বধর্মের রহস্য। অসীম রায়ের মনে পড়বে কি অর্জুনবিষাদযোগের কথা? মহাবল অর্জুনের ক্লৈব্য দূর করবার জন্যেই ভগবান বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন? না, তিনি জানতেন অর্জুন স্বধর্মচ্যুত হচ্ছে, ক্ষাত্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকাই তার কর্তব্য? কারণ অর্জুন তো কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রবেশ করবার পূর্বেও প্রাণীহত্যা করেছে, পরেও করবে। বর্তমানের দুর্বলতা তার স্বধর্মের বিরুদ্ধাচারী। এ কেবল আত্মীয় পরিজন দেখে সাময়িক বিহ্বলতা। তাই ভগবান কঠিন হাতে তার মোহকে ভেঙে দিলেন, জানালেন তোমার কর্মে তুমি তুমি পূর্ব-নির্দিষ্ট অর্থাৎ তোমার স্বধর্ম ধমনীতে শিরায় প্রবাহিত। হঠাৎ-বৈরাগ্য ও অহিংসা নিছক মিথ্যা, নিছক আত্মপ্রতারণা। অর্জুনের স্বভাবে নেই বৈরাগ্য, নেই অহিংসা—তাই আজকের এই বেদনা তার মুহূর্ত বিলাস মাত্র। অথচ মুহূর্তের ভ্রান্তিতেই আজন্মের সমস্ত সিদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। স্বয়ং ভগবান যেমন চালান আমাদের তেমনি পরিচালিত করলেন সখা সব্যসাচীকে।

"নিষ্কাম কর্মের বদলে ত্যাগ" নয় "ত্যাগই নিষ্কামকর্ম", ঠাকুর বুঝিয়েছেন আমাদের বারবার গীতার হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করে। ঠাকুর বলছেন "কর্মযোগ বড়ো কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, হে ঈশ্বর, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি।" আবার বলছেন "তবে কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে! তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা;—কি না, কর্মের ফল আকাজ্ক্ষা করবে না।"

অসীম রায় আবার বিদ্রূপে যোগীর "কনসেশানে"র কথা তুলেছেন। নিজের ধারণায় শিল্পীকে স্বকপোলকল্পনার উচ্চচূড়ে বসিয়ে অত্যাশ্চর্য এক উক্তি করেন "এই বন্ধন কাটানো ছাড়া কিংবা স্ত্রীলোককে বা স-স্ত্রীকে ব্রহ্মময়ীর অংশ বা মা বলে পূজো করা ছাড়া (যা সংসারী জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য প্রস্তাব) তার আর মুক্তি নেই। যোগীর কাছে কখনই মনে হয় না যে জীবজগতের অন্তর্নিহিত যুক্তির ফলে এবং সৃষ্টির তাগিদেই কামিনীকাঞ্চনে বাঁধা এ ভুবন।" এটা ঠাকুরকে কটাক্ষ কিনা জানি না, আমার ভাবতেই অবাক লাগছে ভারতবর্ষের ঔপন্যাসিক উপনিষদ না খুঁজুন, তন্ত্র না জানুন, সাংখ্য দর্শন না পড়ুন, অন্তত মহাভারত জানবেন না, গীতা রহস্যেরই চাবিকাঠি খুঁজবেন না সময়ের? কেন এমন হয়? অশ্রদ্ধায়? অজ্ঞানে? না, বড়ো বেশি অহং-এ? কে বলেছে যোগী জানেন না প্রকৃতির লীলার কথা? কে বলেছে তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে "সৃষ্টির তাগিদে"র "জীবজাগতিক অন্তর্নিহিত যুক্তি" বাদ দাও? ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ? তিনি নিশ্চয়ই বলেছেন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা। কিন্তু কাকে? কেন? কী অর্থে? আমাদের মতো লোকদের, অসীম রায়ের মতো শিল্পীদের তিনি বলেন নি। আমাদের জন্যে শুধু নারদীয়া ভক্তি আর অনাসক্ত কর্মের কথা বলেছেন। বলেছেন "এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না! তখন ঈশ্বরটীশ্বর সব ঘুচে যাবে। একজন তার মাগকে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম'। মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভালো!"

"তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়িতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না! সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটী দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।"

"জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দু খানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।" ঠাকুর এই সঙ্গে পরিবার ও সন্তানের প্রতি দয়ার কথাও বলেন।

অসীম রায় এসব কথা ভাবেন নি, ভাবতে চান নি তাই বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে "সংঘাত" খুঁজে পান, বোঝেন না সমস্ত কর্মের পেছনে অনাসক্তি না এলে কর্মের চরিত্র নষ্ট হয়। উপযোগিতাবাদের গন্ধ লাগে তাতে। রবীন্দ্রনাথ

সেকথা বুঝেছিলেন তাই শচীশের জ্যাঠামশায়কে প্রায় বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতিরূপে পজিটিভিস্ট বানাতে দ্বিধা করেন নি। একথার অর্থ এই নয় যে বিদ্যাসাগর মশায়কে আমি পজিটিভিস্ট বলছি পুরোপুরি, কিন্তু সে ঝোঁক তার ছিল। ঠাকুর সেটা ধরেছিলেন বলেই ওই কথাগুলো বলতে পারেন। তবু বিদ্যাসাগর মশায়ের পজিটিভ কর্মবাদের আড়ালে অহেতুক বেদনা ও কান্নার কাহিনী থাকে বলেই বুঝি যে নিছক পরোপকার তাঁর লক্ষ্য নয়। (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চোখে এ-দিকটা আশ্চর্য প্রতিভাত হয়েছে।)

অসীম রায় বলছেন মানুষ "ধরার ধুলি আঁকড়ে বাঁচতে চেষ্টা করে", এই আসক্তি শিল্পীর মতে "সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র"। মনিবের চাকরিতে বুটজুতোর গোঁজা খেয়েও যে "বাঁচার প্রবল ইচ্ছা" প্রকাশ করে শিল্পীর কাছে তা "প্রবল বিস্ময়ের বস্তু"। এ-প্রসঙ্গে দুটো প্রশ্ন আছে, অসীম রায় দুটোকে গুলিয়ে একটা করে নিয়েছেন। শিল্পীর স্বধর্ম আলোচনায় লোকদের বাঁচামরার কথা অবান্তর। কারণ জীবন যে আছে সে-কথা একান্ত সত্য, যেমন একান্ত সত্য অসীম রায়ের "জীবজাগতিক অন্তর্নিহিত যুক্তি"। কিন্তু যা নিছক দাঁড়াবার মাটি তা নিয়ে তো আলোচনা হয় না, আলোচনা ওঠে তফাৎ কিছু প্রসঙ্গে। যেমন নিছক বাঁচার কথা নিয়ে যদিও আমরা সবাই ব্যাপৃত, নিছক বাঁচাটাই কিন্তু সবার লক্ষ্য নয়। যার নয়, তার কথাই পৃথক বিষয়, আলোচনার ক্ষেত্র। অসীম রায় যদি নিছক বাঁচাতেই "প্রবল আসক্তি" দেখে থাকেন তবে আমার জানা নেই শিল্প সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি। এ-কথা আমি জানি মানুষ, যেমন বলছেন অসীম রায়, কিন্তু কোন মানুষ? অচেতনে যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলছে? "জীবজাগতিক" যুক্তিতেই যারা পরিচালিত? না কি যারা সচেতন কর্মে মানহুঁশ হবার বাসনায় অন্য কিছু, অন্য কোনো পৃথক মানুষ হয়ে উঠছে? যাদের কথাই ঠাকুর বলতে চেয়েছেন, যাদের হয়ে ওঠার যন্ত্রণা ও দহনের কথা লিখেছেন বাল্মীকি, ব্যাসদেব।

আসলে অসীম রায় শিল্পীর স্বধর্ম বিষয়ে চিন্তিত হলেও ভাবেন নি স্বধর্ম কি কেবল লেখা বা আঁকা? না-হয় মেনেই নিলুম যে শিল্পী তা-ই, কিন্তু তিনি কি প্রকাশ করেন? প্রকাশের যন্ত্রণায় তাঁকে তাঁর সত্তাকেই তো খুঁজে ফিরতে হয়, তিনি আছেন আর কী তিনি হবেন, তাঁর অস্তি ও নাস্তির সম্পর্কের ঝঞ্ঝাময় পরিণতির কথা। কারণ, পরিণতির কথাই তাঁর নিজের স্বকীয়তা, পরিণতিই তাঁর অন্বিষ্ট। শিল্পী তাই শিল্পে নিজেকেই খোঁজেন,

অন্য কিছু নয় ; প্রকাশ করেন নিজেকেই, অসীম রায়ের কোনো মানুষ বা প্রবল আসক্তিকে নয়, নিজের ছায়া তিনি দেখতে চান বিশ্বের মুকুরে। এ-কথার পাঠ এই নয় যে শিল্পী তাঁর আত্মজীবনী ফাঁদেন ইনিয়েবিনিয়ে। শিল্পী খোঁজেন যে অনির্বাণ সত্তা, যার দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হবে তাঁর মর্মমূল, যা আসলে তাঁর হৃদয়ের কেন্দ্র আবার জগতেরও কেন্দ্র, যা মুহূর্তের অস্থির গোলাপ ও স্থিরতার আত্মস্থ পদ্ম। তাই তিনি যন্ত্রণার আগুন জেলে নিজেকে পোড়ান, জানার আলো ফেলে ফেলে দেখেন সবার মুখ, যদি মেলে সেই পুরুষ বা রমণী, যাঁদের লীলায় চরাচরের সমস্ত রহস্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাল্মীকি তাই শুধু রামচন্দ্রের বা সীতার কাহিনীই লেখেন না, লেখেন নিজের জাগরণ ও স্বপ্নের সেই পুরুষ বা নারীর কথা যাঁদের মধ্যে তিনি তাঁর সত্তার প্রতিমা দেখেছেন, খুঁজে পেয়েছেন সৃষ্টির অতিমর্ত্য কুঁড়ি। কারণ তিনিই রামচন্দ্র, তিনিই সীতা—তিনিই সমগ্র রামায়ণের প্রশান্ত বিস্তার জুড়ে আছেন।

এই হল শিল্প, এই হল শিল্পীর স্বভাবের অন্বিষা। স্বধর্ম তাই স্বভাবকে প্রকাশ করা। স্বভাবেই ফোটে জ্ঞানের আলো, যোগী তখন হন স্বীয় জীবনের মহাশিল্পী আর শিল্পী আত্মদহনের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ নিরাসক্ত নির্মম তাপস। উপনিষদ তাই সবার পরিণতি ও লক্ষ্যের কথা ওঙ্কারের মন্ত্রে জানান :

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবতন্ময়োভবেৎ ॥

ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন, অপ্রমত্ত হইয়া ভেদ করিতে হইবে। অতঃপর বাণের ন্যায় তন্ময় হইবে।

শান্তি বসু

কালের দর্পণে : ইতিহাস-স্রষ্টা জনসাধারণ

সোভিয়েত চলচ্চিত্রে আইসেনস্টাইন আর পুডভকিনের পাশেই আলেকজান্দার দোভ্‌ঝেন্‌কোর স্থান। চলচ্চিত্রশিল্পের এই তিন বিরাট ব্যক্তিত্ব এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সিনেমা-আর্টের নতুন নতুন দিগন্ত উদ্‌ভাসিত করে তোলেন, নতুন এক আর্টফর্ম হিসেবে সিনেমার বিপুল সম্ভাবনাগুলিকে আবিষ্কার করেন। আইসেনস্টাইন-পুডভকিন-দোভ্‌ঝেন্‌কো তাই শুধু সোভিয়েত সিনেমাতেই নয়, সর্বদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে বিরাট প্রভাব।

সিনেমায় দোভ্‌ঝেন্‌কো যে বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেন, সেটা হলো মূলতঃ প্রতীকীকরণ : মূল বিষয় বা থীমটিকে তিনি সব সময়ে ব্যক্তিরূপ দিয়েছেন, পার্সোনালাইজ্‌ করেছেন। নায়ক আর প্রধান চরিত্রগুলিকে তিনি এমন ভাবে পরিকল্পনা করেছেন যাতে তারা হয়ে উঠেছে সাধারণের প্রতিনিধি, জনসাধারণের বিশেষীকৃত ব্যক্তিরূপ। সুনির্দিষ্ট এক প্লট-বাঁধা গল্পের সিকোয়েন্স অনুসরণ করার চেয়ে দোভ্‌ঝেন্‌কো তাই প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটা বড়ো ও ব্যাপক থীমকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে অবাধে—এবং দুঃসাহসের সঙ্গে—ঘন ঘন কাটিংয়ের সাহায্যে অনেকগুলি খণ্ডদৃশ্যের সমন্বয়ে দর্শকমনে এক সামগ্রিক উপলব্ধি এনে দিতে চেয়েছেন। কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষার চেয়ে তাঁর মনোযোগ বেশি বাছাই করা কতকগুলি ঘটনার গঠন-উপাদান বা স্ট্রাক্‌চারাল এলিমেন্টগুলির দিকে। দোভ্‌ঝেন্‌কোর ছবি দেখার পর দর্শকের স্মৃতিপটে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকে—সুবিন্যস্ত একটি গল্পের চেয়ে—ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি আশ্চর্য ইমেজ, আর সমগ্র ভাবে মন ভরে থাকে একটা গভীর ও মহৎ উপলব্ধিতে, কোনো মহাকাব্য পাঠের পর পাঠকের যেমন মনে হয়।

দোভ্‌ঝেন্‌কোর ছবিগুলি তাই কিছুটা এপিসোডিক মনে হলেও, সব মিলিয়ে তা এপিকধর্মী। তাঁর ছবিগুলি সব সময়েই খুব বড়ো কিছু বলতে চেয়েছে, জীবনের সমগ্রতাকে ধরতে চেয়েছে। সেই জন্যেই, দোভ্‌ঝেন্‌কোর সিনেমাশৈলী হলো একই সঙ্গে রোম্যান্টিক ও বিশ্লেষণমূলক, আবেগনির্ভর ও বুদ্ধিগ্রাহ্য—যে-শিল্পের মধ্যে এক বিরল সমন্বয় ঘটেছে শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতির ও দার্শনিকের সুগভীর উপলব্ধির।

এদিক থেকে তাই 'স্টোরি অফ দি ফ্লেমিং ইয়ার্স্'-কে* দোভ্ঝেন্কোর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা বলা যেতে পারে। এবং, দোভঝেন্কোর এই রচনাটিকে একেবারে নিখুঁত ভাবে ঠিক দোভ্ঝেন্কোর মতো করেই চলচ্চিত্রায়িত করেছেন তাঁর স্ত্রী জুলিয়া সোল্ন্ৎসেভা। ১৯৫৬ সালে দোভ্ঝেন্কোর মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলীর মধ্যে যেসব মৌলিক চিত্রনাট্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হলো এই 'অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কাহিনী'। স্বামীর রচনা এই মৌলিক চিত্রনাট্যকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন শ্রীমতী সোল্ন্ৎসেভা গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। এবং এ কাজে তিনি যে সফল হয়েছেন, তার কারণ—চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে পঁচিশ বছরেরও বেশি কাল ধরে সহযোগিতা করেছেন। দোভঝেনকোর শিল্পীমানসকে, ধ্যানধারণাকে ও বক্তব্য প্রকাশের রূপরীতিকে তিনিই সকলের চেয়ে ভালো ভাবে জানেন। তা ছাড়া, এই স্টোরি অফ দি ফ্লেমিং ইয়ার্স-এর চিত্রনাট্য রচনার কাজেও তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন।

যুদ্ধ আর রক্ত আর আহত-নিহত মানুষ, কামান বোমা ট্রেঞ্চ, আগুন আর বিস্ফোরণ আর ধ্বংস—এই উপাদানে জুলিয়া সোল্ন্ৎসেভার পরিচালনায় স্টোরি অফ দি ফ্লেমিং ইয়ার্স হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব এপিকধর্মী ছবি। যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে তোলা এমন কাব্যময় বলিষ্ঠ ছবি এর আগে আমরা খুব কমই দেখেছি। জীবনের জয়গান হলো এর মূল কথা। এর নায়ক চাষীর ছেলে তরুণ সৈনিক ইভান ওরলিউক এখানে সমগ্র সোভিয়েত জনগণের প্রতীক। আসলে সোভিয়েত জনগণই রূপায়িত হয়েছে এই ওরলিউকের মধ্যে। একটা গোটা জাতির কখনও মৃত্যু হতে পারে না—তাই ওরলিউকও চিরজীবী, যুদ্ধের সেই নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সে অজেয়। আবার একই সঙ্গে সে একজন সাধারণ ব্যক্তিবিশেষ—শক্তিতে দুর্বলতায়, হাসি-কান্নায় যে কোনো সাধারণ মানুষের মতো: শত্রুর মুখোমুখি সে দৈত্যের মতো প্রচণ্ড, সূর্যাস্তের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ কবি। দোভ্ঝেন্কোর একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্র এই ওরলিউক—যার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে সমগ্র সোভিয়েত জনগণের যুদ্ধকালীন মানস।

উক্রাইনে ওরলিউকের সেই ছোট্ট সুন্দর গ্রামখানি যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত, তখন

* গত ১৭ই মে থেকে দু সপ্তাহের জন্যে স্থানীয় জ্যোতি সিনেমায় প্রদর্শিত।

সেই দিগন্তছোঁয়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গ্রামের স্কুলের শিক্ষিকা উলিয়ানার সঙ্গে তার দেখা। বারুদের গন্ধঠাসা বাতাসে তখন বসন্তের আভাস ভেসে আসছে। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জেনারেল গ্লাজুনফ পৌরোহিত্য করলেন ওরলিউক-উলিয়ানার বিবাহ-অনুষ্ঠানে এক ভাঙাচোরা ব্যারাকের মধ্যে।—জীবনের গতি অব্যাহত, সৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

আর, মহাকালের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে বিরাট আয়তন পায় যে অতিসাধারণ মানুষগুলি, সেই সাধারণ মানুষই হলো আসলে ইতিহাসের নায়ক। সেই সাধারণ মানুষেরই জয়গান গেয়েছে স্টোরি অফ দি ফ্লেমিং ইয়ার্স।

সৃষ্টি যে ধ্বংসের চেয়ে বড়ো, জীবন যে মৃত্যুঞ্জয়ী, এ ছবির প্রায় প্রত্যেকটি দৃশ্যে নানা প্রতীকের মধ্যে দিয়ে সেই কথাটি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত রূপে তুলে ধরা হয়েছে: ট্যাঙ্কের চাকার দাগের পাশে হাওয়ায় দুলছে একটি মেঠো ফুল; বোমার আগুনে পোড়া গাছের একটি শাখায় ধরেছে কয়েকটি নতুন রাঙা-সবুজ পাতা। গুলির আঘাতে আহত ওরলিউক মুখ থুবড়ে পড়ে আচ্ছন্ন মনে স্বপ্ন দেখছে যেন সে হঠাৎ পড়ে গেছে তার ছেলেবেলাকার সেই মাছ-ধরার নৌকোটির মধ্যে আর সেই নৌকোটি তাকে নিয়ে ভেসে চলেছে শিশির-ভেজা উইলো-সারির ফাঁক দিয়ে পপলার-সারির নিচ দিয়ে তার শান্ত শ্যামল গ্রামের ঘরখানির দিকে। এই অবিস্মরণীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে একটি হলো—পিছু-হঠা নাৎসী ফৌজের অনুসরণে সোভিয়েত ফৌজের নীপার নদী পার হওয়া: ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর; কামানের গর্জন; অন্ধকার রাত্রির আকাশকে চিরে দিচ্ছে সন্ধানী আলোর রেখা; ফুঁসে উঠে ঘুরপাক খাচ্ছে নীপারের জলস্রোত; পণ্টুনগুলি ডুবছে ভাসছে; হাজার মানুষের প্রতিজ্ঞাকঠিন মুখ, ফুলে ওঠা মাংসপেশী; তারপর এক প্রচণ্ড উল্লাস-গর্জন: নীপারের অপর তীরে এসে উঠেছে ওরলিউকের নেতৃত্বে প্রথম দলটি। আর, শেষ দৃশ্যের সেই সহজ রূপকটুকু কখনও ভুলবার নয়: যুদ্ধে নিহতদের রক্তে ভেজা আর ট্যাঙ্কের চাকায় চষা জমির বুকে বীজ বুনে চলেছে একদল মানুষ আর কয়েকটি বীজ বোনার যন্ত্র।

৭০ মিলিমিটার মাপের সিনেমাস্কোপে তোলা এই রঙীন ছবিটি ১৯৬১ সালে ক্যানেসে চতুর্দশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পায়। এই ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যস্মরণীয় প্রোভোরফ ও তামারিনের নাম—যে দুজন এ ছবির ক্যামেরার কাজ পরিচালনা করেছেন।

রবীন্দ্র মজুমদার।

নাট্য নিয়ন্ত্রণের নতুন ফাঁদ

স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মঞ্চই ছিল সবার স্বাভাবিক প্রত্যাশা। বিশেষ করে সংবিধানের ১৯ ধারায় যখন স্বীকৃত হল যে "সকল নাগরিকেরই বাক্যের ও মত প্রকাশের (অভিব্যক্তির) স্বাধীনতায় অধিকার থাকবে", তখন ব্রিটিশ আমলের পচা নাট্যানুষ্ঠান আইন প্রয়োগ করে স্বাধীন ভারতে নাটকের কণ্ঠরোধ দেখে সমগ্র নাট্যজগতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হল এবং উক্ত আইনটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করার দাবি উঠল। এ-দাবি সংগঠিত রূপ পেল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে। তার কারণও অবশ্য ছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিতে যখন নতুন জীবন, চিন্তা ও ধারণা প্রকাশ পেতে লাগল, তখন তাতে বিচলিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনিক কর্তারা পুরনো আইনটিকে তূণ থেকে বার করে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে লাগলেন। সবচেয়ে নাটক বেশি বাধা পেল পশ্চিম বঙ্গে। আইনের প্রয়োগ কতখানি হাস্যকর হতে পারে একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা উপলব্ধি হবে। কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভিত্তি করে আমার 'তরঙ্গ' নাটক রচিত। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভূমিকা লিখেছেন এবং স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার থেকে আরম্ভ করে বাংলা দেশের বহু সাহিত্যাচার্যই নাটকটির প্রশংসা করেছেন। ১৯৫০ সালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার সেই নাটকটিরই অভিনয় বন্ধ করে দিলেন এই অপবাদ দিয়ে যে, নাটকটি নাকি 'জনরুচিকে বিকৃত করে'! কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে কংগ্রেসেরই স্বাধীনতা সংগ্রামের নাট্যালেখ্য যদি 'জনরুচি বিকৃত করার' অপরাধে দায়ী হয়, তবে তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে! 'তরঙ্গ' নাটকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাবার জন্যে আমাকে যে কত লেখালেখি ও দরবার করতে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। তার আগে এবং পরেও পুলিশের হাতে পড়ে আমার অনেক নাটকেরই ভাগ্যে প্রভূত লাঞ্ছনা জুটেছে এবং লালবাজারে পাণ্ডুলিপি পেশ করলে যে কি দুর্ভোগ ভুগতে হয় তার অভিজ্ঞতা আমার মতো অনেকেরই আছে। যদিও ব্রিটিশ আমলের আইনে নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রাক-অনুমোদনের (প্রি-সেন্সরশিপ) বাধ্যবাধকতা ছিল না; তথাপি পরে কোনোরূপ হাঙ্গামায় না পড়তে

হয়, এই ভেবে অনেকে পুলিশ কমিশনারের অনুমোদন লাভের জন্যে নাটকের পাণ্ডুলিপি, এমন কি নতুন হলে মুদ্রিত নাটকও পেশ করে থাকেন। তার কারণও আছে। বহুক্ষেত্রেই থিয়েটারের মালিকদের ওপর এ-সম্বন্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও গৌণভাবে অশোভন চাপ দেওয়া হয়। নিউ এম্পায়ার মঞ্চ ভাড়া করতে হলে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় তাতে একটি সর্ত আছে যে, নাটক পুলিশ কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। সেই অনুমোদন লাভ করতে গিয়ে অনেককেই নাজেহাল হতে হয়। কর্তারা অনাবশ্যকভাবে দেরি তো করেনই তদুপরি বহুক্ষেত্রেই নাটকের এমন সব অংশ আপত্তিকর বলে চিহ্নিত তাঁরা করেন যা দেখে ক্রুদ্ধ না হলেও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সময় সময় একাধিক দৃশ্যই বাদ দিতে বলা হয়। তার ফলে নাটকের কাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুলিশী হাত পড়লে নাটকের যে কী দুর্দশা হতে পারে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বেরুবে লালবাজারের রেকর্ড ঘাঁটলেই।

এই দুঃসহ অবস্থার অবসান চাচ্ছিলেন নাট্যসেবী মাত্রই। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষিত সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি ক'বছর আগে দিল্লীতে যে সেমিনার বসিয়েছিল তাতেও প্রথম সুপারিশ ছিল ব্রিটিশ আমলের (১৮৭৬) নাট্যানুষ্ঠান আইনটি বাতিল করে দেবার জন্যে। তাতে স্পষ্টই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, স্বাধীন ভারতে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নতির পথে উক্ত আইন বিষম অন্তরায়। অবশেষে এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেই আইন চ্যালেঞ্জ করে এক মামলা রুজু হলে হাইকোর্ট রায় দেয় যে, উক্ত নাট্যানুষ্ঠান আইন অবৈধ ও সংবিধান-বিরোধী। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই রায় দেখে বাংলা দেশের নাট্যসেবী ও নাট্যামোদীরাও এই ভেবে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ আমলের কঙ্কালটির এবার সত্যি সমাধি হল এবং নাটকের বন্ধন দশা ঘুচলো। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। গত ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পুরনো আইনের পরিবর্তে একটি নতুন বিল আমাদের উপহার দিলেন যা দেখে বাংলা দেশের কেবল নাট্যসংশ্লিষ্ট মহলই নন, সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই বিস্ময়ে আঁখি বিস্ফারিত করতে বাধ্য হলেন। বিলটি দেখে আইনজ্ঞরা বললেন, এর দোষগুণ বিচার করা বৃথা—আপাতদৃষ্টিতেই এ বিল পরিত্যাজ্য। নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও নাট্যামোদীরা এই বিলের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে

প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ-বিলের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। একমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে এ-বিলকে সমর্থন করা হয়েছে। তাছাড়া কোনো পত্র-পত্রিকায়ই এযাবৎ এ-বিল সমর্থিত হয় নি। গত ১৩ই মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের এক বিরাট সম্মেলনে এই অনিষ্টকর বিলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে অবিলম্বে বিলটি সর্বসাকুল্যে প্রত্যাহারের দাবিতে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই বিলের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জনমত আজ জাগ্রত।

নাটকের কণ্ঠরোধের জন্যে এমন একটি শাণিত খড়্গ উদ্যত করার এমন কি কারণ ঘটল, এই বিল আনয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কী, তা কিন্তু বিলের মুখবন্ধে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। শুধু বলা হয়েছে: "A Bill for better control of dramatic performances in West Bengal, 1962." বাংলা দেশের নাট্যজগতে এমন কি অঘটন ঘটল বা নাটকের দরুন এমন কি বিপর্যয় দেখা দিল যাতে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার দুঃস্বপ্নের ঘোরে এমন একটা কদর্য আইন দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কৃতসংকল্প হলেন! বিলটি অভিনিবেশসহ পড়ার দরকার হয় না। চোখ বুলিয়ে গেলেই একে সরকারী হঠকারিতার একটি নমুনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। না হলে তাঁরা পুলিশ কমিশনার ও জেলা শাসকদের নাট্যসাহিত্যের চূড়ান্ত বিচারক বলে ঠাওরালেন কেমন করে! বিল অনুযায়ী তাঁদের অনুমোদন না পেলে কোনো নাটকই অভিনয় করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের নাট্যানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখে নিশ্চয়ই পুলকে শিউরে উঠতেন এবং দু-হাতে পুষ্পবৃষ্টি করতেন; কারণ তাঁরও নাটক মঞ্চস্থ করতে হলে এই বিধান অনুযায়ী পুলিশ কমিশনার বা কোনো জেলা শাসকের কৃপাদৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হবে! রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য যাঁরা বহন করে চলতে চাইবেন তাঁদের অঙ্কুশবিদ্ধ করার জন্যে ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহ্য-বাহকরা আজ বদ্ধপরিকর। তাই যদি না হবে তবে চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব ও চলার স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এমন একটি বিল রচনা করতে রচয়িতার হাত অবশ্যই কাঁপত। একটি রাজ্য সরকার কর্তৃক সংবিধান-ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা কী ভাবে সম্ভব—তা বুদ্ধির অগম্য!

শুধু কি তাই? যাঁরা নাট্যাভিনয় করতে চাইবেন তাঁদের প্রতিটি নাটকের

অভিনয়-অনুমতি লাভের জন্যে সরকারকে পঞ্চাশ টাকা করে সেলামী দিতে হবে। সেখানেই শেষ নয়। যেখানে অভিনয় হবে সেখানকার জন্যে দুশো টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে—তা সে বছরে সেখানে একবারই অভিনয় হোক কি তার বেশিই হোক। তারপর নাটকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো প্রমোদনুষ্ঠানই বাদ যাবে না—শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন গাওয়াতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে—অন্তত বিলের বর্তমান বিধান ব্যাখ্যা করলে তাই দাঁড়ায়। ব্রিটিশ আমলের শাসকরা দয়া করে তবু যাত্রাগান ও ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত আমোদপ্রমোদ আইনের আওতা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। বর্তমান বিল সর্বগ্রাসী। মঞ্চ নাটক, যাত্রা, নৃত্য, ছায়ানাট্য, মূকাভিনয়, জলসা, কবিগান, তরজা, কীর্তন, আবৃত্তি প্রভৃতি সবই আইনের গণ্ডিতে এসে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'কেও হার মানায়। কী দূরদৃষ্টিই ছিল কবির! সাধে কি তাঁকে বলা হয় ঋষি!

দণ্ডবিধানও কড়া। আগেকার আইনে ছিল তিন মাস কারাদণ্ড বা পঁচিশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা। স্বদেশী শাসকরা সেখানে আইন ভঙ্গের অপরাধে ছ-মাস পর্যন্ত জেল দিতে ও হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবেন। কথায় বলে 'ভাত দেবার মুরদ নেই কিল মারার গোঁসাই'। এও সেই দশা। নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এমনিই বাধার অন্ত নেই। সেদিকে যদি কর্তাদের দৃক্‌পাত থাকত। অথচ শাসন করার জন্যে ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা উৎসাহ।

বিলটি পড়লেই মনে হয়, বাংলাদেশের নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা যেন খুন-জখম, সমাজদ্রোহিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ইত্যাদি প্রচারের জন্যে ষড়যন্ত্র করে উঠে পড়ে লেগেছেন আর কল্যাণরাষ্ট্রের প্রভুরা সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার জন্যে এরূপ একটি দমনমূলক আইন না করে পারছেন না। আসল কথাটা তাঁরা মুখ ফুটে বলতে হয়তো একটু লজ্জা পাচ্ছেন। সুখস্বাচ্ছন্দ্য-ভরা আনন্দোজ্জ্বল দেশের যে-ছবি সরকারী প্রচারযন্ত্রে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, দেশের আসল ছবি যে তা নয়। কোনো নাটকে সেই আসল ছবি ফুটে উঠলে কর্তাদের কৃত্রিম প্রচার ব্যর্থ হয়ে যায়। জনসাধারণ আসল ছবিকেই সম্বর্ধনা জানায় ও মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। সেসব নাটকই হয়তো কর্তাদের কাছে অবাঞ্ছিত। তাই তা দমনের জন্যে আইনের প্রয়োজন। আইন হাতে থাকলেই কর্তাভজাদের সুবিধে দেওয়া যাবে এবং যারা বেসুরা

গাইবে তাদের কণ্ঠরোধের পথ সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সংবিধান অনুযায়ী যখন সবারই চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে তখন সেই অধিকার হরণ করে আইনের সাহায্যে দমনের এই অপচেষ্টা কেন? নাট্যকার বা নাট্যশিল্পীরা তো গুপ্ত সমিতি করে বোমা-পিস্তল নিয়ে লড়াইয়ের ষড়যন্ত্র করেন না। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ্যেই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য শিল্পকলার মাধ্যমে উপস্থিত করেন। সেখানে ভজহরির দলও তাঁদের কর্তাভজা কীর্তন গাইতে থাকুন না। যাদের যা ভালো লাগবে তারা তাই নেবে। সেখানে সরকারী শাসন কেন? সমাজবিরোধী, দেশের স্বার্থবিরোধী গর্হিত কিছু নাটকে থাকলে জনসাধারণই তা বর্জন করবে। শিল্প জনগণের। অতএব তার চূড়ান্ত বিচারকও তারাই। তা না করে গণের রুচি ও বিচারের প্রতি গণতান্ত্রিক সরকারের এত অবিশ্বাস কেন যে, তাঁরা নিজেরাই নাট্যকলার একমাত্র মুরুব্বি সেজে বসতে চাচ্ছেন?

বিলটি ইতিমধ্যেই বহু আলোচিত ও নিন্দিত। তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে আছে বলে মনে হয় না। বিলটি যে কত অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও স্ববিরোধী, কেউ যদি ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যাটি সংগ্রহ করে পড়েন তবে তিনি অনায়াসেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। বিলটি নিজের চেহারা নিজেই দেখাবে; ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার হবে না।

প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিল সম্পর্কে জনমত প্রকাশ পেয়েছে। তবে আরো ব্যাপকভাবে জনমতের অভিব্যক্তি হওয়া দরকার এই কারণে যে, বিধান সভায় জেদের বশবর্তী হয়ে ভোটের জোরে সরকার-সমর্থক সদস্যরা যদি শেষ পর্যন্ত বিলটি বৈধই করেন তবে তার আগেই যেন তাঁরা একথা জানতে পারেন, বাংলা দেশের সুস্থ জনমতের বিরুদ্ধে জেনেশুনেই তাঁরা রায় দিলেন। আর যদি সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের শুভবুদ্ধি থাকে তবে অবশ্যই তাঁরা জনসাধারণের রায় মেনে নিয়ে বিনা দ্বিধায় সম্পূর্ণ বিলটি প্রত্যাহার করবেন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়-এর এই সংখ্যা ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শোকাবহ মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'পরিচয়'-এর আজীবন বন্ধু ও সুহৃদ।

আগামী সংখ্যায় তাঁর জীবন ও সাধনার পরিচয় দিয়ে আমরা যথাসাধ্য স্মৃতি-তর্পণ করব।

সংস্কৃতি সংবাদ

পঁচিশে বৈশাখ ও বাংলা ভাষা

সরকারী কাজকর্মের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সম্প্রতি বাংলাভাষা চালু হয়েছে ইংরেজীর জায়গায়। কলকাতা পৌরসভার কাজেও অনুরূপ পরিবর্তনের খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাটিকে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত করার জন্য এই পরিবর্তনের সূত্রপাত করা হয়েছে পঁচিশে বৈশাখ থেকে।

পশ্চিম বাঙলার সাধারণ মানুষ অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে বিশেষ আনন্দিত এবং এক্ষেত্রে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমর্থনও করছেন অকুণ্ঠচিত্তে। কয়েকটি কথা তবু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে যখন শুভব্রতটিকে জড়িত করা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পুণ্য নামের সঙ্গে।

পঁচিশে বৈশাখ থেকে যা শুরু হয়েছে আসলে তা একটি বিস্তৃততর কর্মকাণ্ডের সূচনামাত্র। একথা বলার সময়ে আমরা শিক্ষার সর্বস্তরে বাঙলা-ভাষাকে বাহন করার বা আদালত কাছারীতে বাঙলা প্রবর্তনের ইঙ্গিতও করছি না। কারণ শ্রেয় হলেও তেমন কোনো সিদ্ধান্ত হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দিয়ে গ্রহণ করানোই যায়নি, নয়ত বা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবেই করানো গেছে। 'বিস্তৃত কর্মকাণ্ড' বলতে আমরা এখানে শুধু বাংলাকে এ রাজ্যের সরকারী ভাষা করার গৃহীত সিদ্ধান্তটির কথাই বলতে চাইছি। কিন্তু তার চৌহদ্দীর মধ্যেও যে সব কাজ পড়ে তার সামান্য একটিমাত্র অংশই আসলে শুরু হয়েছে পঁচিশে বৈশাখে। কারণ বাংলাকে সরকারী ভাষা করতে হলে গেজেট, বিলের খসড়া, আইন সভায় গৃহীত আইন, সরকারী দলিলপত্র, হুকুমনামা, রেকর্ড ও তাবৎ সরকারী প্রকাশনা (নেপালী ভাষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা সহ) বাংলাভাষাতেই করতে হবে। এর কোনটিই কিন্তু পঁচিশে বৈশাখ থেকে শুরু হচ্ছে না। এমন কি জনসাধারণের প্রতি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট অথবা আন্তর্বিভাগীয় চিঠিপত্রও পুরোপুরি বাংলায় চালানোর ব্যবস্থাও হয়নি এখনও। যা হয়েছে তা ২৪শে বৈশাখ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্যেই পরিস্ফুট: 'আগামীকাল থেকে আমাদের দপ্তরখানায় নথিপত্র লেখার কাজে এক বিপ্লবের সূচনা হবে। সেক্রেটারি ও মাননীয় মন্ত্রীরা তাঁদের মন্তব্য ও নির্দেশ বাংলায় দেবেন। আবশ্যকমত ইংরেজী কথার ব্যবহার

চলবে। আমি আশা করি সরকারী কাজে বাংলাভাষাকে ধীরে ধীরে মর্যাদার আসনে বসাতে পারব (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৭)।' আর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বাধ্যবাধকতা আরো একটু প্রসারিত করে স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগীয় মন্ত্রী এক চিঠিতে আশা প্রকাশ করেছেন যে পঁচিশে বৈশাখ থেকে সমস্ত বিভাগীয় কর্মচারীরাই নথিপত্রে যথাসাধ্য বাংলাভাষা প্রয়োগ করবেন।

সুতরাং হালের সিদ্ধান্তটি সমর্থনযোগ্য হলেও তাকে বিস্তৃততর এক কর্ম-কাণ্ডের অঙ্গ হিসেবে দেখাই সমীচীন এবং এর সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করবে ক্রমান্বয়ে পরবর্তী অপরিহার্য ব্যবস্থাগুলিকে ঘটিয়ে তোলার উপরেই। নইলে 'বিপ্লবের সূচনাকেই' 'বিপ্লব' ভ্রমে যে আত্মশ্লাঘার উদ্ভব হবে তা নিতান্তই হাস্যকর এবং ক্ষতিকরও।

এমন আশঙ্কা যে নেহাৎ অমূলক নয় সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পৃষ্ঠপটটিকে বিচার করলেই তার প্রমাণ মেলে। সংবিধানের ৩৪৫ নং ধারা অনুযায়ী কোনো রাজ্যের সরকারী ভাষা নির্দ্ধারণের অধিকার দেওয়া হয়েছে সেখানকার আইনসভাকেই—তবে আইনসভা সেরূপ কোনো আইন পাশ না করলে ইংরেজীই চালু থাকবে আগের মত। আশ্চর্যের ব্যাপার না পশ্চিম বাংলার সরকার, না এখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ কেউই এই ধারা প্রয়োগ করে বাংলাকে সরকারী ভাষায় পরিণত করার জন্য তৎপর হননি বছরের পর বছর। বরঞ্চ বঙ্গবিহার সংযুক্তির মারাত্মক প্রস্তাব সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো উল্টোপথেই ধরার উপক্রম করেছিলেন প্রকারান্তরে। তারপর ১৯৫৭ সনে ভাষা-কমিশনের সুপারিশে সন্ত্রস্ত বাঙালী যখন এ বিষয়ে প্রথম কিছুটা ব্যাপক ও গভীর মনোনিবেশ করলেন তখনই সর্বপ্রথম এমন লক্ষণ দেখা গেল যার থেকে মনে হতে পারে যে রাজ্য সরকার হয়ত বাংলাভাষার দাবি উপেক্ষা করতে পারবেন না শেষ পর্যন্ত। দু বছর আগে, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তির উৎসবের জোয়ারে ভেসে অবশেষে সরকার ভাষাসংক্রান্ত আইন মারফৎ স্থির করলেন যে ১৯৬৩ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাই এ রাজ্যের সরকারী ভাষা হবে।

এই নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরোনোর আর মাস ছয়েক বাকি অথচ লক্ষণ দেখে বোধ হচ্ছে না যে বাংলাকে সরকারী ভাষা করা হবে বলতে যা বোঝায় সে-কাজের খুব বেশি এগিয়েছে ইতিমধ্যে। যেমন, আগে যদি বা ক্যালকাটা

গেজেটের দু-চার পৃষ্ঠা বাংলায় ছাপা হত, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরের ছ-মাসে দেখা যাচ্ছে যে মোট ১৯৮ পৃষ্ঠার মধ্যে সেখানে দু-কলম মাত্র ছাপা হয়েছে বাংলায়। এই হারে চললে হাজার দুই বছর লাগবে সরকারী ভাষা-আইনকে পুরোপুরি কার্যকর করতে। সরকারের পরিভাষা কমিটিও বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও প্রশাসনের প্রত্যেকটি বিভাগের খুঁটিনাটি, কমবেশি প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি শব্দেরই বাংলা পরিভাষা নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করেছেন। অথচ ঐ কমিটি মিলিত হয় মাসে একবার এবং প্রতি অধিবেশনে গড়ে একশো, বড় জোর দেড়শো বছর লাগবে পরিভাষা সংগ্রহে। ওদিকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন সভায় বলেছেন: 'অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পণ্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে—রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থার্মোমিটার, প্রেসারগেজ, বয়লার, কাটার, ইলেকট্রন, এটম, ব্যাকটিরিয়া, ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোইফিসিয়াণ্ট, ইন্টিগ্রেশন—এ প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস।' শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ২৮শে বৈশাখের 'যুগান্তরে' লিখিছেন: "...অক্সিজেনকে যবক্ষারযান করিবার কি প্রয়োজন? পুলিশকে 'আরক্ষা' করিবারই কি প্রয়োজন? ময়দানের ইংরেজ শাসক কর্তাদের স্ট্যাচু সরাইবারও একটা মানে থাকিতে পারে, কিন্তু এই ভাবে জটিল ও কুটিল পরিভাষা সৃষ্টি করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।'

তারপর বাংলা টাইপরাইটারের কথা। স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগীয় মন্ত্রী পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে ভরসা দিয়েছেন: 'উপযুক্ত পরিমাণ উন্নত ধরণের টাইপরাইটিং যন্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। সেই কমিটির কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে (যুগান্তর. ২১শে এপ্রিল)। লক্ষ্যণীয় এই যে আইন পাশের দেড় বছর পরেও এর চাইতে বেশি ধরাছোঁয়ার মত কোনো আশ্বাস সরকারের তরফ থেকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এখনও: শর্টহ্যাণ্ডের অবস্থাও তথৈবচ। দেড় বছর আগে সরকারী ভাষা বিল আলোচনার সময়ে বিরোধী পক্ষ থেকে উপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণ কোম্পানীর সঙ্গে বাংলা টাইপরাইটারের ব্যাপারে পাকা বন্দোবস্ত করা, বাংলায় বি. এ অনার্স বা এম. এ পাশ কিছু যুবককে বৃত্তি দিয়ে বাংলা শর্টহ্যাণ্ড বা টাইপরাইটিং শেখানোর ব্যবস্থা প্রভৃতির যে সব প্রস্তাব দেওয়া

হয়েছিল, বোঝা যাচ্ছে সরকার তার উপরে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেন নি এই সময়ের মধ্যে।

একদিকে এই আঠারো মাসে বছর অন্যদিকে 'বিপ্লব' ঘটাচ্ছি, 'বাংলা-ভাষাকে মর্যাদার আসনে বসাচ্ছি'—এ-ধরণের ফাঁকা আত্মশ্লাঘা সরকারের তরফের এই দুই অবাঞ্ছিত মনোভাবের ফলে আসল কাজটি ব্যাহত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। স্বরাষ্ট্র (প্রচার) মন্ত্রী তো গেয়েই রেখেছেন: "নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে আইন প্রয়োগের জন্য প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি তিনি পরিষদকে দিতে পারছেন না। যদিও তার চেষ্টা চলবে যথাসাধ্য। সেক্ষেত্রে সরকারকে হয়তো আবার পরিষদের সামনে আসতে হবে মেয়াদ-বৃদ্ধির জন্য।"

আসলে ব্যাপারটি যে শুধু 'বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে বসানোরই' নয়। এর সঙ্গে যে জড়িত রয়েছে এ রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের সত্যকার ও প্রাথমিক স্বাধিকারের প্রশ্ন—এই গণতান্ত্রিকবোধের একান্ত অভাব প্রকট হচ্ছে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপ। যাঁর নামের সঙ্গে জড়িত করা হচ্ছে এই শুভস্থচনাকে, মাতৃভাষা ও এদেশের মানুষের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করার ব্যাপারে তাঁর অক্লান্ত সাধনাকে একদা অনায়াসে অবজ্ঞা করতে পেরেছিল তখনকার দিনের বিদেশী শাসকের দল। কিন্তু স্বদেশী শাসক যাঁরা 'বিপ্লবের' কথা বলছেন ও তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত করছেন তাঁদের কাজকে তাঁরাও কি আজ ভুলে যাবেন কবির কথা:

"রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই বলি না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে বলেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত, তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগ্যে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বুই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।......

"কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।' তিনি এই ভাবেই

বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীয় শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী অর্থাৎ, আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য-অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটি কয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?" (পল্লী সেবা)

আর কবির কথাকে যে সব কেজো লোক আজ নেহাৎই 'কবিকল্পনা' বলে এক পাশে সরিয়ে রাখতে চাইবেন তাঁদের জবাবও তিনি দিয়ে গেছেন: "আজ পর্যন্ত কেজো-কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।"

চিন্মোহন সেহানবীশ

জন্মদিনে নজরুল

কবি নজরুল ইসলাম পুরাণোক্ত কোনো বীরই যেন, শাপগ্রস্ত।

যৌবন-জয়ের এই কবি এখন শারীরিক অস্তিত্বেই মাত্র অস্তিত্ববান,—তাঁর চৌষট্টিতম বর্ষপূর্তিও ব্যতিক্রম নয়,—হৃত-শক্তি, স্মৃতি-রিক্ত, রহিত-বাক্।

আর, নজরুল যেখানে অকস্মাৎ থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন,—ঠিক তিনচার দশক আগে বাঙলা কবিতার জগতে তাঁর বিপুলপ্রবল আবির্ভাব এবং আবির্ভাবেই দিগ্বিজয়ের মতই যা আবারও ভীষণ, চকিত, আকস্মিক, —তারপর থেকে শুধু তাঁর দেহেরই ক্রমাগত বয়স বাড়ছে, প্রত্যেক জন্মদিন একটু একটু করে খসিয়ে নিচ্ছে অজস্র ছবিতে চেনা সে চিরযুবার কালো-কুঞ্চিত একরাশ কেশদাম, তার জায়গায় জুড়ে বসেছে বয়োবৃদ্ধের উন্মুক্ত, তালুপ্রসার কপালের নিয়ত ঊর্ধ্বচারিতা, রগের দু'পাশ ঘেঁষে ক্রমেই পাতলা হয়ে নেমে-আসা রূপালী চুল; আর সবার উপরে অথবা সর্বাগ্রে তাঁর মুখাবয়বের মূক অভিব্যক্তির মধ্যে সেই আয়ত চোখ জোড়া কেবলই উদ্‌ভ্রান্তি কিংবা দৃষ্টি যা শুধুই শূন্যতার, বোধহীনতার।

তাঁকে ঘিরে তাঁরই জন্মদিনের উৎসবে তিনি নিজে যেন এক আগন্তুক। চারপাশে স্তূপাকার ফুল, জন্মদিনের গোড়েমালা আর অগুরু-চন্দনের মাঝে নিতান্তই অসহায়, বাধ্য, নিরুৎসুক কেউ।

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গ-সাহিত্যে সর্বকালের প্রধান-পুরুষ,—অথচ এই কবি-বিপ্লবীকেই না জরুরী তারবার্তা পাঠান সে যুগে বৃটিশ আমলের হুগলী জেলে অনশন, ভঙ্গ করাতে—"আমাদের সাহিত্য তোমায় দাবি করে।" তাঁর 'বসন্ত' নাট্যকাব্য তার উৎসর্গ-পত্র তো এই: "শ্রীমান নজরুল ইসলাম-কে।" নজরুলের বাহুল্য, অতিশয়োক্তি, এমনকি বেহিসেবী প্রতিভা, তাও তো রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত নয়। "আয় চলে আয় রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু/দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন": রবীন্দ্রনাথের থেকে এমন অভ্যর্থনা তো বাঙলা কাব্যে এক নজরুলেরই ললাটিকা।

তবু, কাজী নজরুল ইসলাম একালের কাণে বড় বেশি সরব, উচ্চারিত, বড় কম আধুনিক? যদিও প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে আধুনিক বাঙলা কবিতায় এরকম জীবন্ত সমসাময়িকত্বের ইমেজ নজরুলেই সম্ভবপর হয়: "...আমি টর্পেডো, আমি ভীম/ভাসমান মাইন," বড় বেশি "প্লেবিয়ান" স্বভাব-কবিত্বে: "আমি তাই করি ভাই যখনই চায় এ মন যা/করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা/আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা!" যদিও সেই অতিখ্যাত আত্ম-ম্যানিফেস্টো "বিদ্রোহী"রই: "আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি/আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।" এরকম শুদ্ধতার পঙক্তি বাঙলা কবিতায় কতবার লিখিত হয়, আমি জানি না।

নজরুলের নিজস্ব স্মৃতিভ্রষ্টতার চেয়ে নজরুল-বিষয়ে একালের এই একপেশে বিস্মরণও কম শোকাবহ নয়। বোধহয়, একালের অতি-তরলীকৃত, রক্তাল্প পঙক্তি সাধনার, আলাপের ঝোঁকে, নজরুল একটু বেশি গ্রামে চড়া। তাঁর সমকালের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে গিয়ে নজরুল হয় তো একটু মাত্রারিক্তভাবেই তা চুকিয়ে ফেলেন, সম্ভবত, নিজেও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত না থেকেই।

কিন্তু, সমকাল আর চিরকালের মধ্যে শিল্পীর কাছে কী এতই দুস্তর ব্যবধান?

বোধহয় তো একালের আপাত-স্বাচ্ছন্দ্যের, সুযোগের কাছে, সেই পরাধীন যুগের কবিত্বের কঠিন-জ্বালা, কারও কারও ভাষায় বা অগ্নিস্পর্শ যেমন নজরুলের, কারও কাছে আজ অসুখের মতো, অস্বস্তির মতো লাগে। হয়তো, নজরুল সেজন্য অনেকের স্নায়ুর উপর বড় বেশি চাপ!

এবং যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কথনে বলেন:

"শিকল দেবীর এই যে পূজাবেদী,
চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি

আর, নজরুল শুধুই বলেন:

"শিকল পরা ছল রে মোদের
শিকল পরা ছল
ওই শিকল পরেই, শিকল তোদের
করব রে বিকল।"

কিংবা:

"গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক, কে সে রাজা,
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত, স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসী..."

তখন নজরুলের এই উন্মাদনা কি শুধুই নিছক উন্মদনার?

বাংলা কবিতায় "সপ্ত-নরকের" পর "হাবিয়া-দোজখ" শব্দে আরবি-ফার্সীর জোর ভরে দেওয়া কি বাঙলা ভাষায় নজরুলের কবিকৃতির ফলশ্রুতি নয়?

রবীন্দ্রনাথের উত্তর-বর্তীদের মধ্যে কবি-গীতিকার-সুরকার বাঙলা দেশে যে একজন নজরুলই, একথা না হয় আবার নাই বলা গেল। বাঙলা কাব্যগীতির সংখ্যাও রবীন্দ্রনাথের পর নজরুলে এসে স্তিমিত হলো না। বাঙলা গানে গজলের প্রবর্তনাও কি গীতিকার নজরুলের মৌলিকত্বের দান নয়? কিংবা লোকগাথার মিশ্র সুরে;

"একাদশীর চাঁদ রে ওই
রাঙা মেঘের পাশে
যেন কাহার ভাঙা কলস
আকাশ গাঙে ভাসে":

এরকম উজ্জ্বল লৌকিক চিত্রকল্প রচনাও কি নজরুল-গীতিকায় বিরল-দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখিত হবে?

চিরকাল আর কতো দাবি রাখে সময়-সীমিত কবিকর্মের কাছে ?

১৯২৯ সাল। ত্রিশ বৎসরের পূর্ণযৌবনে কবি নজরুলের নাগরিক সংবর্ধনা তৎকালের অ্যালবার্ট হলে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত। অভিনন্দনের প্রতিভাষণে নজরুল বলছেন : "আমাকে বিদ্রোহী বলে খামকা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ, কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছে আমার কোনোদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকে মরণ তাদেব তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। সুন্দরের ধ্যানী দুলাল কীটসের মতো আমারও মন্ত্র "beauty is truth, truth is beauty."

সাগরপারের কবির দোহাই মেনে "সত্য ও সুন্দর, সুন্দর ও সত্যে"র সাক্ষ্য কবি নজরুল তবে কাদের জন্য তুলে রাখতে চেয়েছিলেন ?

সিদ্ধেশ্বর সেন

আধুনিক তুরস্কের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাম্যবাদী এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নাজিম হিকমতের মৃত্যুসংবাদ 'তাস' প্রচার করেছেন। সম্প্রতি ৬১ বৎসর বয়সে মস্কোয় তাঁর জীবনাসন হল। সৈনদের আইন অমান্য করাতে প্ররোচিত করার অভিযোগে এবং কমিউনিজম প্রচারের জন্য কবি হিকমৎ-কে তুরস্কে দীর্ঘ তের বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ১৯৫০-এ মুক্তিলাভের পর তিনি চলে যান রুশ দেশে এবং গত বছর সোভিয়েত নাগরিকত্ব লাভ করেন।

কবি হিকমৎ বাঙলাদেশে একটি প্রিয়, পরিচিত নাম। বাঙলা প্রগতি সাহিত্যে, বিশেষত কাব্যে হিকমৎ-এর প্রভাবও অনস্বীকার্য। 'পরিচয়'-এর পাঠকরা অনুবাদের মাধ্যমে নানা সময়ে তাঁর রচনার সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছেন। 'পরিচয়'-এর এই সংখ্যার প্রস্তুতির সমাপ্তি-মুখে কবি নাজিম হিকমৎ-এর মৃত্যু-সংবাদ আমাদের গভীরভাবে বিচলিত করল। তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 'পরিচয়'-এর পরবর্তী এক সংখ্যায় প্রকাশের ব্যবস্থা হবে।

পরিচয়

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

আগামী শ্রাবণে পরিচয় ৩৩ বর্ষে পা দেবে। এই উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মত এবারও শ্রাবণ সংখ্যা পরিচয় বিশেষ সমালোচনা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। নির্বাচিত দেশী-বিদেশী বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনার মধ্য দিয়ে দেশ বিদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হবে এই সংখ্যায়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমালোচক ও সুধীবৃন্দ এই ব্যাপারে পরিচয়-এর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

এজেন্টরা অগ্রিম চাহিদা জানান
গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত
মূল্য দিতে হবে না

**নিয়মিত পরিচয় পেতে হলে গ্রাহক
হওয়াই শ্রেয়**

চাঁদা : বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫·৫০

